মঙ্গল কাব্যের কাহিনী

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী, বি.এ.

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যসূচী অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর দ্রুতপঠনের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লিখিত।
Vide N. T. B. No. Syll/14/86 dated 12. 10. 86.

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী
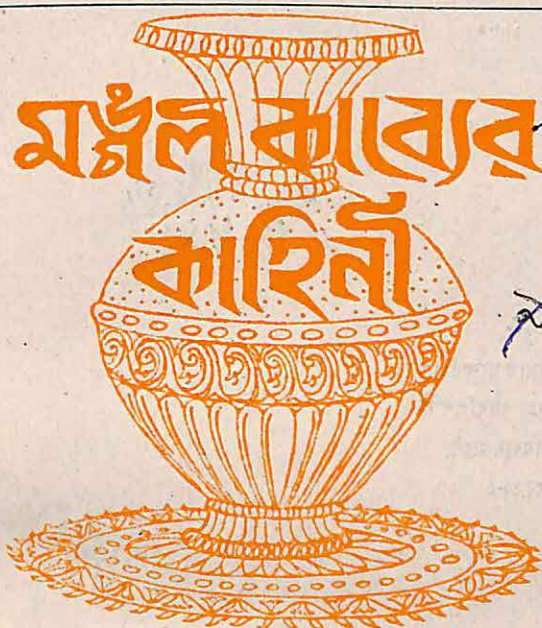
[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী, বি.এ.

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
নভেম্বর, ১৯৮৬

প্রকাশক :
রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীললিতমোহন পান
লক্ষ্মী জনার্দন প্রিন্টার্স
২৬/২এ, সিমলা রোড
কলিকাতা-৬

মূল্য ঃ আট টাকা

সূচীপত্র

শিবের মনে একদিন সৃষ্টির বাসনা হলো। ফলে কালিদহের ফুল-বনে এক সুন্দরী কন্যার জন্ম হলো। শিবের মানস-কন্যা বলে শিব তার নাম রাখলেন—মনসা। এ ছাড়া পদ্ম পাতার ওপরে মনসার জন্ম হয়েছিলো বলে তার আর এক নাম হলো—পদ্মা।

নবজাত কন্যাটিকে শিব নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন না তাঁর স্ত্রী চণ্ডীর ভয়ে। তাই মনসাকে পাতালে আশ্রয় নিতে হলো। সেখানে মনসা হলেন সাপদের দেবতা।

একদিন বাবা মহাদেবের সঙ্গে দেখা হলে মনসা তাঁর বাবাকে বললেন, কৈলাসে গিয়ে তিনি মা চণ্ডীকে দেখবেন। মেয়ের কথা শুনে শিব কী আর করেন! নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তিনি তাঁকে কৈলাসে নিয়ে এলেন।

মনসা মা চণ্ডীর কাছে এসে বললেন, চণ্ডী তাঁর মা আর শিব হচ্ছেন তাঁর বাবা। চণ্ডী মনসার কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না, বরং ভীষণ রেগে গিয়ে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে টেনে হেঁচড়ে তাঁকে ভীষণ ভাবে প্রহার করলেন। প্রহারের চোটে মনসার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল!

মা-বেটিতে ঝগড়া হচ্ছে দেখে শিব নিরুপায় হয়ে মেয়ে মনসাকে সিজুয়া পর্বতে রেখে এলেন। মেয়েকে পর্বতে রেখে আসার সময় শিব মনে খুবই দুঃখ পেয়ে কেঁদে ফেললেন,—তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়লো। মুহূর্তে ঐ চোখের জল থেকে আর একটি মেয়ের জন্ম হলো। চোখের জল থেকে মেয়েটির জন্ম হওয়ায় শিব এই মেয়েটির নাম রাখলেন নেত্রবতী বা নেতা।

মনসা দেবতার মেয়ে অথচ দেব-সমাজে তাঁর কোনও প্রতিষ্ঠা নেই। কিন্তু একদিন এক অপূর্ব সুযোগ এলো। দ্বিতীয় বার সমুদ্র মন্থন করায় ভয়ংকর বিষ উঠে এলো। তখন বিশ্ব-সংসারকে রক্ষা করার জন্যে মহাদেব ঐ বিষ পান করলেন। পান করার পর বিষের জ্বালায় তিনি ঢলে পড়লেন!

কী করে এই মহা সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? তখনই ডাক পড়লো মনসার। মনসা এসে মন্ত্র বলে তাঁর বাবা—শিবকে বিষমুক্ত করলেন। ফলে স্বর্গে মনসা দেবতার সম্মান পেলেন। তাঁর স্থান হলো কৈলাসে।

তারপর?

তারপর শিব যথাসময়ে জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিয়ে দিলেন। একটি পুত্র সন্তান (আস্তিক) জন্মাবার পর মুনি ঘর ছেড়ে

তপস্যায় ব্রতী হলেন। এদিকে মা চণ্ডীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাপের বাড়ি মনসার কাছে অসহ্য বোধ হতে লাগলো। শেষে একদিন মনসাও বাপের বাড়ি কৈলাস ছেড়ে অজানা পথে বের হলেন। এই সময়ে নেতা তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন, মর্ত্যে পুজো প্রচারিত হলে তাঁর সব দুঃখ ঘুচবে। মর্ত্যলোকে শিবভক্ত চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগরের অশেষ প্রতিপত্তি। তাঁর বাস চম্পক নগরে। চম্পক নগরের এই চাঁদ বেনের কাছ থেকে পুজো আদায় করতে পারলে মনসার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে।

এক শিবভক্ত বিদ্যাধর মনসার অভিশাপে চম্পক নগরে কোটীশ্বর নামে এক বণিকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর। তাঁর স্ত্রীর নাম সনকা। সনকা গুণবতী মহিলা। মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে চাঁদ সদাগর পরম শিবভক্ত বলে খ্যাতি লাভ করলেন। তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট করে চাঁদ শিবদত্ত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাজ্ঞান মন্ত্রের অধিকারী হলেন।

চাঁদের ছ' ছেলে, ছ' পুত্রবধূ। সপ্ত ডিঙা সাগরে ভাসিয়ে চাঁদ সদাগর বাণিজ্যে যান। বিরাট তাঁর অট্টালিকা। জন্ম থেকেই চাঁদ সাপের পরম শত্রু। সাপ দেখা মাত্র হেঁতালের লাঠি নিয়ে মারতে যান। এ ছাড়া চম্পক নগরে ধন্বন্তরি, শঙ্খ প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত সাপের ওঝাদের বাস। এহেন শিবভক্ত চাঁদের কাছ থেকে সাপের দেবতা মনসার পুজো আদায় করা ভীষণ কঠিন কাজ।

তবুও মনসার পুজো পাবার চেষ্টার শেষ নেই। তাই মনসা প্রথমে কৌশলে সমাজের নীচু শ্রেণীর ভেতরে নিজের পুজো প্রচার করলেন। চম্পক নদীর কাছে খেয়া দিতো দুই কৈবর্ত ঝালু আর মালু। মনসা বিধবা ব্রাহ্মণীর বেশে ঝালু-মালুকে পাঁচটি ঘট দিয়ে মনসার পূজো করার উপদেশ দিলেন। চাঁদের ভয়ে তা'রা গোপনে মনসার পূজো সুরু করলো। মনসার কৃপায় তাদের দুঃখ-দুর্দশাও

ঘুচলো। চাঁদের স্ত্রী সনকা যখন জানতে পারলেন যে, ঐভাবে পুজো করলে মনসাদেবী তুষ্ট হন, তখন তিনি পরিবারের মঙ্গল কামনায় মনসার ঘট নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে গোপনে মনসার পুজো করতে লাগলেন।

এ খবর চাঁদের কানে যেতে তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে হেঁতালের লাঠি দিয়ে মনসার ঘট ভেঙে দিলেন, আর স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, এ-বাড়িতে যেন কোনও দিন মনসার পুজো না করা হয়।

এতে মনসাও খুব রেগে গেলেন। এবার সুরু হলো প্রতিশোধ নেওয়া। মনসাও প্রতিজ্ঞা করলেন, বিদ্রোহী চাঁদ সদাগরকে নাকাল না করে তিনি ছাড়বেন না। তা-ই তাঁর আদেশে সাপেরা এসে চাঁদের বাড়ির বাগানটিকে তছনছ করে দিলে। কিন্তু 'মহাজ্ঞান' চাঁদের আয়ত্তে, তাই তার শক্তিতে নষ্ট বাগানটিকে তিনি আবার সুন্দর করে তুললেন। এতে মনসা আরো ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি তখন মায়াজাল বিস্তার করে প্রথমে চাঁদের 'মহাজ্ঞান' হরণ করলেন, তারপর সাপ পাঠিয়ে, আর বিষ প্রয়োগ করে, একে একে চম্পক নগরের সব ওঝাদের মেরে ফেললেন। তারপর অনন্ত আর বাসুকি নাগের সাহায্যে চাঁদের ছ'-ছ'টি ছেলেকে মেরে ফেললেন। পুত্রহারা চাঁদ সদাগর আর সনকার হৃদয় পুত্র শোকে কাতর হলো। তবুও চাঁদ বিচলিত হলেন না। বললেন,—

"যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পূজিব পুনি চ্যেংমুড়ী কানি॥"

ঐ ঘটনার পর মনসার প্রতি চাঁদের ঘৃণা আরও বেড়ে গেল, শিবভক্ত চাঁদ সাপে কাটা মরা ছ' ছেলেকে ভেলায় চাপিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন,—মনে মনে ভাবলেন, হিংস্র স্বভাবা মনসার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

পুত্রশোকে কাতর চাঁদ সদাগর তখন স্ত্রী সনকা আর ছ' পুত্রবধূর

করুণ বিলাপ সহ্য করতে না পেরে বাণিজ্য যাত্রা করলেন। সনকা ছিলেন তখন গর্ভবতী।

এদিকে মনসার কোপ দিন দিন বাড়তে লাগলো। শেষে শিবের মধ্যস্থতায় স্থির হলো বিদ্যাধর অনিরুদ্ধ আর তাঁর স্ত্রী ঊষা মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করে চাঁদকে দিয়ে মনসার পুজো করাবেন। দেব সভায় নাচের সময় মনসার ছলনায় তালভঙ্গের অপরাধে অনিরুদ্ধ আর ঊষাকে মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করতে হলো। সনকার গর্ভে জন্ম নিলেন অনিরুদ্ধ। তাঁর নাম রাখা হলো লখিন্দর, আর ঊষা জন্ম নিলেন উজানী নগরের সায় বেনের ঘরে, তাঁর নাম রাখা হলো বেহুলা।

সাগর পথে নানা জায়গায় বাণিজ্য করার পর সিংহলে চাঁদ সদাগরের সবগুলি ডিঙিই বাণিজ্য পণ্যে বোঝাই হলো। এবার মহামূল্য সম্পদ নিয়ে চাঁদের দেশে ফেরার পালা। দেশে ফেরার পথে ডিঙি এসে পড়লো কালিদহে। এখানে চাঁদের সর্বনাশ করতে এগিয়ে এলেন মনসা। হঠাৎ আকাশ হলো মেঘাচ্ছন্ন, চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল, ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝায় সাগরের জল ফুলে ফেঁপে উঠলো! চাঁদ বুঝতে পারলেন, এ যাত্রা আর রক্ষা নেই। নৌকো ডুবি হলে তিনিও প্রাণে মারা যাবেন। ঠিক এমন সময় মেঘের আড়াল থেকে মনসা চাঁদকে জানালেন যে, এক মুঠো ফুল তাঁর নামে নিবেদন করলে তিনি ধনজনে রক্ষা পাবেন, এ-ছাড়া তাঁর মরা ছেলেরাও প্রাণ ফিরে পাবে,—তাঁর সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। কিন্তু মনসার এই প্রলোভনে চাঁদ ভুলবেন এমন দুর্বলচেতা মানুষ তিনি নন। তা-ই তিনি মনসার কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন!

চাঁদ সদাগরের এই ভ্রূকুটি মনসার সহ্য হলো না। তাঁর ভয়ংকর রোষে একে একে চাঁদের সবগুলি ডিঙা ডুবলো,—অর্ধ-অচৈতন্য চাঁদ সদাগর ঢেউয়ের ওপরে অসহায়ের মতো ভাসতে লাগলেন। চাঁদ

মরলে মনসার পুজো প্রচার হয় না; তা-ই চাঁদকে বাঁচাবার জন্যে মনসা এক গোছা পদ্ম ফুল জলে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারলো। সেই আলোতে ঐ ফুল দেখে আশ্রয় পাবার আশায় চাঁদ ভাসমান ফুলের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, ফুলগুলি পদ্ম, আর তার সঙ্গে পদ্মাবতী বা মনসার নামের মিল আছে, তখনই তিনি দারুণ ঘৃণায় নিজের হাত সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি 'শিব' 'শিব' বলে চীৎকার করতে লাগলেন।

মনসার মায়ায় কোন মতে প্রাণ পেয়ে তিনি তীরে উঠে এলেন। তীরে উঠে এসে অপরিচিত জায়গায় নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি আশ্রয়ের আশায় কিছুদিন ঘুরে বেড়ালেন। শেষে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো, কিন্তু সে মনসার পুজো করে জেনে চাঁদ তার বাড়িতে জলস্পর্শ করলেন না। সেখান থেকে নানা দেশ ঘুরে, বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সুদীর্ঘ বারো বছর পরে চাঁদ নিজের দেশে ফিরলেন। চাঁদ যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর অবস্থা প্রায় পাগলের মতো। সনকা হৃতসর্বস্ব স্বামীকে দেখে কাঁদতে লাগলেন।

যা হোক্ পুত্র লখিন্দরের দিকে তাকিয়ে চাঁদ তাঁর সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলবার চেষ্টা করলেন। লখিন্দর বড়োই আদরের ছেলে। এবার তিনি ঠিক করলেন লখিন্দরের বিয়ে দেবেন। অনেক পাত্রী খোঁজার পর রূপে-গুণে অতুলনীয়া সায় বেনের মেয়ে বেহুলাকেই তাঁর পছন্দ হলো। ঘটা করে এই মেয়ের সঙ্গে লখিন্দরের বিয়েও দিলেন।

চাঁদ জানতে পেরেছিলেন যে বিবাহ বাসরে সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হবে। সনকা চাঁদকে ছেলের মুখ চেয়ে মনসাকে তুষ্ট করার জন্যে একটি ফুল মনসার উদ্দেশে নিবেদন করতে বললেন; কিন্তু শিবভক্ত চাঁদ এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না।

মনসার সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্যে সাঁতালি পর্বতের উপরে চাঁদ সুদক্ষ কারিগরদের দিয়ে একটি লোহার বাসর ঘর তৈরি করিয়ে

নিলেন। একটি ফুটোও ঐ ঘরে থাকবার কথা নয়, যাতে সাপ কোনও রকমেই ঐ ঘরে ঢুকতে না পারে। কিন্তু মনসা দেবীর আদেশে কারিগর ঐ ঘরে গোপনে একটি ছিদ্র কেটে রেখেছিলো। চাঁদ এ-কথা জানতেন না। তিনি বেহুলা-লখিন্দরকে ঐ লোহার বাসর ঘরে পাঠালেন। অসংখ্য নেউল আর ময়ূর ঐ লোহার বাসর ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এ-ছাড়া সাপের বিষ-প্রতিষেধক নানা রকমের ওষধিও ঐ বাসর ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

এদিকে মনসা সাপদের ডেকে এনে ঐ ঘরের ভেতরে ঢুকে লখিন্দরকে কামড়াবার জন্যে একে একে পাঠাতে লাগলেন। রাতের প্রথম প্রহরে বঙ্করাজ, দ্বিতীয় প্রহরে কালদণ্ড এবং তৃতীয় প্রহরে উদয়কাল নামে তিন তিনটে সাপকে তিন প্রহরে পাঠালেন।

কিন্তু বেহুলা কৌশলে তিনটে সাপকেই কলসীর ভেতরে বন্দী করে রাখলেন। রাতের শেষ প্রহরে লখিন্দর জেগে উঠে বেহুলাকে বললেন, ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর।

স্বামীর কথায় অন্য উপায় না দেখে বেহুলা নারকেলের উনুনে নিজের পট্টবস্ত্রের আঁচল জ্বালিয়ে মঙ্গল কলসীতেই কয়েক মুঠো চাল সিদ্ধ করলেন। এদিকে রাত প্রায় শেষ ; বেহুলা খাবার জন্যে লখিন্দরকে ডাকছেন। রাত জাগার ক্লান্তিতে তাঁর চোখ দুটোও ঘুমে জড়িয়ে আসছে।

এদিকে পর পর তিন তিনটে সাপ বাসর ঘরে ঢুকে ফিরে না আসায় রাত্রির শেষ প্রহরে মনসার আদেশে কাল-নাগিনী লোহার বাসর ঘরে ঢুকলো। কিন্তু বিনা অপরাধে লখিন্দরকে দংশন করতে না পেরে সে বাসর ঘরের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরার সময় লখিন্দর কাল-নাগিনীর গায়ে পা দিতেই সে রেগে গিয়ে তাকে কামড়ে দিয়ে বাসর ঘরের

ফুটো দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। বিষের জ্বালায় লখিন্দর কাতর স্বরে বলে উঠলেন,—

"জাগো ওহে বেহুলা সায় বেনের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি॥"

সঙ্গে সঙ্গে বেহুলা জেগে উঠলেন। তারপর সোনার জাঁতির আঘাতে কাল-নাগিণীর লেজটি কেটে ফেললেন। তারপর মৃত স্বামীর বুকের উপর লুটিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

ক্রমে সকাল হলো! বেহুলার করুণ আর্তনাদে আকাশ বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণের ভেতরেই এই দুঃসংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, ছড়িয়ে পড়লো লখিন্দরের দেহে প্রাণ নেই! সনকা আর চাঁদ সদাগর ছুটে এলেন। সনকা পাগলিনীর মতো মরা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন। কিন্তু চাঁদের চোখে জল নেই, শুধু পুঞ্জীভূত রাগ তাঁকে উন্মাদ করে তুললে! তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন!

তারপর?

তারপর কলার মান্দাস (ভেলা) তৈরি করা হোলো। ঐ মান্দাসের ওপরে লখিন্দরের মৃতদেহ কোলে নিয়ে সতী শিরোমণি বেহুলা চেপে বসলেন। তাঁর অঙ্গীকার, স্বামীকে নিয়ে তিনি সাগরের জলে ভাসতে ভাসতে যে ভাবেই হোক্ দেবপুরে গিয়ে মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলবেন। বেহুলাকে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা এ ভাবে অকূল সাগরে ভাসতে নিষেধ করলে; কিন্তু তিনি কারো কথা শুনলেন না। তিনি নির্ভয়ে কলার মান্দাসের ওপরে বসে মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে অনির্দেশের পথে এগিয়ে চললেন।

বেহুলা নদী পথে এগিয়ে চলেছেন। পথে নোতুন নোতুন বিপদ তাঁর সামনে এলো; কিন্তু সতীত্বের তেজে তাঁর বিপদ কেটে যেতে লাগলো। দিন যায়, রাত আসে, বেহুলা ভেসেই চলেন। শবদেহ পচে গলে গেল, দেহের মাংস খসে পড়লো, রইলো কেবল

কয়েক খানা হাড়। বেহুলা জলে ধুয়ে স্বামীর হাড় ক'খানা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে চললেন। কারণ তাঁকে দেবপুরে পৌঁছুতেই হবে।

কয়েক মাস পর বেহুলার ভেলা এসে ঠেকলো নেতা ধোপানীর ঘাটে। নেতা স্বর্গের দেবতাদের কাপড় কাচেন। এই নেতা বা নেত্রবতী অন্য কেউ নন, পদ্মা বা মনসার সহচরী। এক অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী এই নেতা। বেহুলা লক্ষ্য করলেন, কাপড় কাচার সময় নিজের কোলের বাচ্চাটিকে নেতা আছড়িয়ে মেরে ফেলেন, কাপড় কাচা, কাপড় শুকানো শেষ হলে ঐ মরা বাচ্চাকে তিনি বাঁচিয়ে তোলেন! এ-এক অদ্ভুত ব্যাপার! বেহুলা এই দৃশ্য দেখে নেতার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। বেহুলার বুক ফাটা কান্নায় নেতার মন গলে গেল। তিনি কথা দিলেন, বেহুলাকে স্বর্গপুরীতে নিয়ে যাবেন।

বেহুলা নেতার সঙ্গে দেবধামে হাজির হলেন! দেবাদিদেব শিব বেহুলার দুঃখের কাহিনী শুনলেন। শুনে শিব বেহুলাকে বললেন, তুমি যদি নাচ দেখিয়ে স্বর্গের দেবতাদের তুষ্ট করতে পারো তাহলে তুমি তোমার মৃত স্বামীকে ফিরে পাবে।

বেহুলা এই প্রস্তাবে রাজি হলেন! তাঁর অপরূপ নাচে খুশি হয়ে দেবতারা তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বললেন, স্বামীর জীবন ফিরে পেলেই তিনি খুশি হবেন। তখন শিবের আদেশে তাঁর মানস কন্যা মনসা মৃত লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে রাজি হলেন। তবে একটি শর্তে, শর্তটি হলো, মর্ত্যে ফিরে গিয়ে শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে দিয়ে সে মনসার পুজো করাবে। বেহুলাও এই প্রস্তাবে রাজি হতে মনসা দেবী খুশি হয়ে মন্ত্রের প্রভাবে লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তুললেন। শুধু তা-ই নয়, মনসা চাঁদের আর ছ' ছেলে আর অন্যান্য মৃতদেরও প্রাণ দান করলেন, চাঁদের ডোবা ডিঙি-গুলোকেও তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

এরপর ধনরত্ন বোঝাই চোদ্দটি ডিঙা সাজিয়ে, স্বামী আর ভাসুরদের নিয়ে সতীত্বের বিজয় মুকুট পরে বেহুলা গাঙ্গুরের ঘাটে ফিরে এলেন। খবর পেয়ে চাঁদ উন্মাদের মতো ছুটে এলেন ; কিন্তু মনসার পুজো করতে হবে শুনে তিনি কারো দিকে না তাকিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

বেহুলা তখন কী আর করেন! শ্বশুরের পা দুটি জড়িয়ে ধরে তাঁকে মনসার পুজো করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। ছেলেদের আর ধন-ঐশ্বর্যের দুঃখ চাঁদকে বিচলিত করতে পারেনি ; কিন্তু দুঃখিনী বেহুলার মুখের দিকে চেয়ে চাঁদকে পরাজয় স্বীকার করতে হলো,—তিনি মনসার পুজো করতে রাজি হলেন।

চাঁদের এই পরাজয় দেবতার কাছে নয়, স্নেহের কাছে। বেহুলার জীবনপণ সাধনাকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তা-ই তিনি বেহুলার অনুরোধে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে মনসার পায়ে এক মুঠো ফুল নিবেদন করলেন। মনসাও সানন্দে ঐ নিবেদিত ফুল গ্রহণ করে খুশি হলেন।

সেই দিন থেকে মর্ত্যে ব্যাপক ভাবে মনসার পুজো প্রচারিত হলো। এর কিছু কাল পরে শাপভ্রষ্ট অনিরুদ্ধ আর ঊষা রথে চেপে স্বর্গ রাজ্যে ফিরে গেলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে বাধা নেই যে, মনসা যেমন পুরোনো দেবী তেমনই মনসার 'ভাসান বা গীত—' 'বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী'ও এদেশে বহু কালাবধি প্রচলিত। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পুরো শ্রাবণ মাস ধরে এই কাহিনী এখনও গীত হয়ে থাকে।

বাঙ্‌লা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় শতাধিক কবির লেখা মনসামঙ্গল কাব্যেব পুঁথি পাওয়া গেছে। এঁদের ভেতরে কানা হরিদত্ত, কবি বিজয় গুপ্ত, কবি বিপ্রদাস পিপলাই, কবি নারায়ণ দেব, কবি দ্বিজ বংশীদাস, কবি ক্ষেমানন্দ, কবি জগজীবন ঘোষাল, কবি জীবন মৈত্র, কবি বিষ্ণু পাল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করার মতো।

॥ প্রশ্নালোচনা ॥

১। মনসা কে? কোথায় এবং কি ভাবে তাঁর জন্ম হয়েছিলো?

২। চণ্ডী কে? মনসা চণ্ডীর কাছে এসে কি বলেছিলেন? তার ফলে কি হয়েছিলো?

৩। —একদিন এক অপূর্ব সুযোগ এলো। —এই সুযোগটি কি? এর ফলে কার কি লাভ হয়েছিলো?

৪। শিব যথা সময়ে কার সঙ্গে মনসার বিয়ে দেন? বিবাহের পর মনসার কি হলো?

৫। চাঁদ সদাগর কে? তাঁর স্ত্রীর নাম কি? মনসামঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৬। বেহুলা আর লখিন্দর কে? এঁরা মর্ত্যলোকে এসেছিলেন কেন? স্বর্গলোকে এঁদের কি কি নাম ছিলো?

৭। বেহুলা ও লখিন্দরের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ।

৮। লখিন্দরের বিবাহের পর মনসার সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্যে চাঁদ সদাগর কি কি করেছিলেন? তিনি কি শেষ পর্যন্ত মনসার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে পেরেছিলেন?

৯। যে সব কবি 'মনসার ভাসান' বা 'মনসার গীত' রচনা করেন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ চারজন কবির নাম লেখ।

কালকেতুর কাহিনী...

মনসামঙ্গলের বেশি প্রচলন হয়েছিলো পূর্ববাঙ্‌লায় আর উত্তর-বাঙ্‌লায়। পশ্চিমবাঙ্‌লায় কিন্তু বেশি সমাদৃত হয়েছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য আর পূজো প্রচারের কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। এখনো গ্রাম বাঙ্‌লার গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় চণ্ডীমঙ্গলের পুজো করা হয়ে থাকে, আর এই পুজোর সময় গ্রাম বাঙ্‌লার মেয়েরা 'মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রতকথা' ভক্তি সহকারে পাঠ করে থাকে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দু'টি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—কালকেতু ব্যাধ আর ধনপতি সদাগরের কাহিনী। এই দু'টি কাহিনীর কোনটিই আমাদের প্রাচীন পুরাণে দেখতে পাওয়া যায় না। এ কাহিনী যেমন লৌকিক তেমন-ই এতে বর্ণিত চণ্ডীদেবীও। কালকেতুর কাহিনীটি পড়লে বেশ বোঝা যায় যে, আদিতে অরণ্যচারী ব্যাধজাতীয় মানুষেরাই চণ্ডীর পুজো করতো এবং এই চণ্ডীদেবী নিঃসন্দেহে বন্য পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কাজেই বলতে বাধা নেই যে, অনার্য সমাজে এঁর জন্ম। অনার্যরা যখন আর্যদের সঙ্গে মিশে গেল তখনই তাদের দেবতাটিও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন।

আগেই বলেছি, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দু'টি অংশে বিভক্ত—'কালকেতু ব্যাধের কাহিনী' আর 'ধনপতি সদাগরের কাহিনী'। দেবী চণ্ডীর কৃপায় দরিদ্র কালকেতু কী ভাবে রাজ্যেশ্বর হলো সেই গল্পই বলছি শোন,—

চণ্ডীদেবীর মনে সুখ নেই, কারণ তাঁর স্বামী শিব শ্মশানবাসী, আত্মভোলা, সংসারের প্রতি তাঁর একেবারেই খেয়াল নেই। এজন্যে শিব-পার্বতীর সংসারে নিত্য অভাব। স্বামী-স্ত্রীতে একারণে নিত্য ঝগড়া হয়। পার্বতীর দুঃখ দেখে তাঁর সহচরী পদ্মা তাঁকে বলেন, মর্ত্যে ভক্তের পুজো গ্রহণ করলে তাঁর দুঃখ ঘুচবে। পদ্মার এই উপদেশ চণ্ডীর মনে ধরলো!

এবারে স্বর্গের দেবতা মর্ত্যলোকে নিজের পুজো প্রচারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চণ্ডীদেবী মনে মনে ঠিক করলেন, ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে মর্ত্যে নিয়ে এসে ব্যাপকভাবে তাঁর পুজোর প্রচলন করবেন। এখন কী করে দেবপুরবাসী ইন্দ্রের ছেলেকে মর্ত্যে পাঠানো যায়? এজন্যে দেবী চণ্ডী শিবকে অনুরোধ করলেন অভিশাপ দিয়ে নীলাম্বরকে মর্ত্যে পাঠাতে। কিন্তু নিরপরাধকে শাপ দেওয়া শিবের পক্ষে সম্ভব নয়। তা-ই শিব স্ত্রীর এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তখন দেবী ছলনার আশ্রয় নিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র রোজ শিবের পুজো করতেন। পুজোর ফুল তুলতো নীলাম্বর। একদিন নীলাম্বর ফুল তোলার জন্যে স্বর্গের নন্দন কাননে গিয়ে দেখলেন—কাননে একটিও ফুল নেই, স্বর্গকানন ফুলহীন।

এদিকে ইন্দ্রের মন ফুলের জন্যে ব্যাকুল। সেজন্যে ফুলের আশায় নীলাম্বর মর্ত্যলোকের এক ফুল বাগানে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন,—এক ব্যাধ একটি হরিণকে শিকার করার জন্যে অনুসরণ করছে! ব্যাধকে দেখে এবং ব্যাধজাতির স্বাধীনতার আনন্দের তুলনায় নিজের পরাধীনতার দুঃখে তাঁর প্রাণ বিক্ষুব্ধ হলো। দেবী চণ্ডী মর্ত্যে নিজের পুজো প্রচারের জন্যেই নন্দন কাননকে ফুলহীন করে মায়াবলে ছোট্ট একটি পোকার রূপ ধরে একটি ফুলের ভেতরে লুকিয়ে রইলেন। অন্য ফুলের সঙ্গে নীলাম্বর ঐ ফুলটিও মর্ত্য থেকে এনে পিতাকে নিবেদন করলেন। সেই ফুলে ইন্দ্র শিবপুজো করলে কীটরূপী চণ্ডী শিবকে দংশন করলেন। বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে শিব, নীলাম্বরকে শাপ দিলেন,—'মর্ত্যে গিয়ে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করো।' নীলাম্বরের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। তিনি কাতর স্বরে শিবকে বললেন, না জেনে অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন! নীলাম্বরের কাতর প্রার্থনায় শিবের মন একটু নরম হলো; কিন্তু অভিশাপ তো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—তা-ই মর্ত্যে তাঁকে যেতেই হবে। তবে সেখানে গিয়ে চণ্ডীর সেবা করলে অল্পকালের ভেতরেই নীলাম্বরের শাপ মোচন হবে।

মর্ত্য-কাননে ফুল তোলার সময়ে নীলাম্বর যে ব্যাধকে দেখেছিলেন —তার নাম ধর্মকেতু। শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর তারই পুত্র হয়ে জন্ম নিলেন। তার নাম রাখা হলো কালকেতু। আবার এদিকে নীলাম্বরের বউ ছায়া 'ফুল্লরা' নামে মর্ত্যলোকে সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

ব্যাধের ছেলে হলেও কালকেতু সুদর্শন, দেখলে চোখ জুড়িয়ে

যায়। কালকেতু শুধু রূপবান নয়, তার পরাক্রমেরও সীমা নেই, তার যেমন তেজ তেমন-ই সাহস। এদিকে ফুল্লরাও রূপবতী। এছাড়া তার গুণের কথাও বলে শেষ করা যায় না। এই রূপবতী আর গুণবতী ফুল্লরার সঙ্গে এগারো বছর বয়সে কালকেতুর বিয়ে হলো।

বিয়ের পর মা-বাবার বার্ধক্যে সংসারের ভার পড়লো কালকেতু আর ফুল্লরার ওপরে। অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও মনের আনন্দে তাদের দিন কাটে। কালকেতু বনে বনে শিকার করে ফেরে, বনের পশু মেরে ঘরে নিয়ে আসে ; ফুল্লরা সেই পশুর মাংস হাটে-বাটে বেচতে যায়। স্বামীর প্রীতি আর ভালোবাসা পেয়ে কায়িক পরিশ্রমকে সে কোনও কষ্ট বলেই মনে করে না। তা-ই বলতে হয়, ফুল্লরার সুখী জীবন।

পরাক্রান্ত কালকেতুর শিকার দক্ষতায় কলিঙ্গ দেশের বনের পশুরা ভীষণ ভীত হয়ে পড়লো। যতো শক্তিশালীই হোক্না কেন কোনো পশুরই তার হাত থেকে নিস্তার নেই, ফলে বনের পশু-সমাজ নির্বংশ হতে চললো। বনের পশুরা দেবী চণ্ডীর আশ্রিত। তা-ই তারা অনন্যোপায় হয়ে দেবীর শরণাপন্ন হলো। অসহায় পশুদের কান্না আর দুরবস্থা দেখে দেবী তাদের আশ্বাস দিলেন, পশুদের আর কোনও ভয় নেই, এর প্রতিকার তিনি করবেনই। চণ্ডীদেবী তা-ই স্থির করলেন, কালকেতুকে পশুশিকার থেকে নিবৃত্ত করতে হবে ; আর তাকে তিনি রাজা করবেন। এতে পশুরাও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে আর সেই সঙ্গে তাকে দিয়ে নিজের পুজো মর্ত্যলোকে প্রচার করাবেন !

এই ভাবে দেবী চণ্ডী কালকেতুকে ছলনা করার জন্যে একদিন মায়াজাল পাতলেন, তিনি সোনালী রঙের এক গোসাপের রূপ ধরে পথের ধারে পড়ে রইলেন, আর বনের ভেতরে কুয়াসা ছড়িয়ে বনের পশুপাখীদের লুকিয়ে রাখলেন। ফলে সেদিন কালকেতু বনে শিকার

করতে এসে সারাদিন ঘুরেও কোনো শিকার পেলে না। তা-ই তার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ,—একটি পশুও নিয়ে যেতে না পারলে ফুল্লরাই বা কী বলবে! কালকেতু যখন বিষণ্ণ মনে এই সব কথা ভাবছে তখন হঠাৎ পথের ওপরে দেখতে পেলে ঐ সোনালী গোসাপটিকে। কোনো পশু যখন আজ পাওয়া গেল না তখন—

"তর্জন গর্জন করে বান্ধে বীর গোধিকারে
ধনুকের হুলে বান্ধি রাখে!"

উদ্দেশ্য 'শিক-পোড়া' করে এর মাংস খাবে। তাই সে বললে,

"যাত্রা কালে তোমা দেখি বনে ফিরি হৈয়া দুখী
নকুল বদলে তোমা খাইব।
পড়িলা আমার হাতে এড়াবে কেমন মতে
জীয়ন্ত লইয়া পোড়াইব॥"

এদিকে হাটে বাসি-মাংসের ক্রেতা না থাকায় ফুল্লরাও সেদিন কিছু যোগাড় করতে পারেনি। দূর থেকে সে স্বামীকে শূন্য হাতে ঘরে ফিরতে দেখে কপালে করাঘাত করতে লাগলো। পরে কালকেতুর মুখে সব কথা শুনে সে বললে,—

"আজ মহাবীর বল সম্বল উপায়।"

তখন কালকেতু বললে, তোমার সই বিমলার মায়ের কাছ থেকে কিছু খুদ ধার করে নিয়ে এসে তার জাউ, আর দু-তিন হাঁড়ি লালতের শাক রান্না কর; আর এই গোসাপের ছাল ছাড়িয়ে শিক-পোড়া করো। আজ আমি তোমার বদলে এই বাসি-মাংসের পসরা নিয়ে গোলাহাটে বিক্রী করতে যাই। যদি বিক্রী হয় তবে ঋণ শোধ করে দেবো। এই বলে কালকেতু গোলাহাটের দিকে রওনা হলো, আর ফুল্লরা গেল তার সইয়ের বাড়িতে চাল ধার করতে।

দু'জনেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলে সোনালী গোসাপ রূপিনী চণ্ডীদেবী এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী নারীর রূপ ধরে ঘর আলোকিত করে ঘরে বসে থাকলেন। ফুল্লরা ঘরে ঢুকেই এই অপরিচিতা রূপসী

তরুণীকে দেখে চমকে উঠলো। তারপর সে তার পরিচয় জানতে চাইলে, তরুণী বললে, সে এক বামুনের ঘরের বউ, সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। এমন সময় কালকেতু তাকে দেখতে পেয়ে তার কুটিরে নিয়ে এসেছে।

এই কথা শুনে ফুল্লরার মুখ শুকিয়ে গেল। যা হোক্ সে তার মনের আশঙ্কা গোপন রেখে ছলনাময়ী চণ্ডীকে বোঝাতে লাগলে, স্বামীর ঘরে যতোই ঝগড়াঝাটি লেগে থাকুক না কেন, স্বামীকে ছেড়ে মেয়েদের কখনোই পরের ঘরে থাকতে নেই, কারণ স্বামীই হলো নারীর একমাত্র গতি।

ফুল্লরার এই উপদেশ তরুণীর কানেই গেল না। তাই সে বললে—

"বন্দ্য বংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল,
সাত সতী গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল।
তুমি ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি,
এই স্থানে কথ দিন করিব বসতি।"

এই কথা শুনে ফুল্লরা ভাবলে, এতো অভাবের ওপর সপত্নীর জ্বালা দুঃসহ। তা-ই সে নিজের অভাবের কথা শুনিয়ে তরুণীকে নিরস্ত করার জন্যে তার বারো মাসের দুঃখের কাহিনী বলতে লাগলে,—

তার তালপাতার ঘরটি ভেরেণ্ডার খুঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের ঝড়ে তা উড়ে যায়। প্রখর গরমের সময়ও তাকে মাংসের পসরা নিয়ে রাস্তায় বের হতে হয়। বর্ষাকালে রাস্তায় বের হওয়া যায় না—ঘরে বসে উপবাসে থাকতে হয়। ভাদ্র মাসে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় তার কুটির ভেসে যায়; আশ্বিনের আনন্দ-উৎসবের দিনেও তাকে পেটের চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে হয়। শীতের সময় 'হরিণের ছাল' পরে আর গায়ে দিয়ে তাকে অন্নের চিন্তায়

ঘুরে বেড়াতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসেও তার ঐ একই অবস্থা। সেজন্যে ফুল্লরা বললে,—

"ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥"

তরুণী তবুও ঘর ছেড়ে যেতে রাজি হয় না। বলে,—"আজি হইতে আমার ধনে তোমাদেরও অংশ আছে।"

ফুল্লরা কী আর করে? তখন সে অনন্যোপায় হয়ে স্বামীর সন্ধানে হাটের দিকে ছুটতে থাকে। পথে ফুল্লরাকে কাঁদতে দেখে কালকেতু বলে,—

"শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা;
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলা রাতা।"

ফুল্লরার কথা শুনে কালকেতু তো অবাক! সে আবার কোন্ সুন্দরী নারীকে ঘরে নিয়ে এসেছে! তারপরে কুটিরে এসে দেখে ফুল্লরার কথাই ঠিক!

কালকেতু প্রথমে সুন্দরী তরুণীকে কাতরভাবে তাকে নিজের ঘরে ফিরে যেতে বললে। কিন্তু সমস্ত অনুনয়-উপদেশ যখন কার্যকরী হলো না তখন,—"ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেন তীর"; কিন্তু কালকেতুর হাতের তীর হাতেই রইলো, দেবীর দৃষ্টিপাতে তীর ছোড়ার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। তখন চণ্ডী হাসতে হাসতে নিজের পরিচয় দিয়ে কালকেতুকে একটি মূল্যবান আংটি, আর সাত-ঘড়া ধন দান করলেন। সেই বনে জঙ্গল কেটে নগর তৈরির আদেশ দিয়ে দেবী কালকেতুকে পশু বধ করতে নিষেধ করলেন। তারপর নিয়মিত ভাবে চণ্ডীর মাহাত্ম্য-প্রচারের নির্দেশ দিয়ে, কালকেতুকে আশীর্বাদ করে দেবী অন্তর্হিতা হলেন। যাবার সময় বলে গেলেন,—

"পূজিবে মঙ্গলবারে পাতাইবে জাত।
গুজরাট নগরের তুমি হবে নাথ॥"

পরদিন সকালবেলা কালকেতু মুরারি শীল নামে এক বেণের কাছে মূল্যবান আংটিটি বেচতে গেল। প্রথমে সে কালকেতুকে প্রতারণা করে বললে,—

"সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাছা করেছ উজ্জ্বল।"

এমন সময় দৈববাণী হলো, মুরারি শীল গরীব ব্যাধকে যেন না ঠকায়—এই আংটি কালকেতুকে দেবী চণ্ডীর দেওয়া।

চণ্ডীর কৃপায় কালকেতুর দুঃখ-কষ্ট দূর হলো। সে কলিঙ্গ রাজ্যের গুজরাটে বন কাটিয়ে নগরের পত্তন করলে, আর সেখানকার রাজা হলো।

কালকেতু রাজা হবার পর ভাঁড়ু দত্ত নামে এক দুষ্ট প্রকৃতির লোক তার মন্ত্রী হতে চাইলে, কিন্তু এই প্রস্তাবে সে অপমানিত হওয়ায় সে কলিঙ্গ রাজের কাছে গিয়ে কালকেতুর নামে মিথ্যে অভিযোগ করলে। কলিঙ্গরাজ কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করে কালকেতুকে বন্দী করলেন। কারাগারে কালকেতু চৌত্রিশ অক্ষরে চণ্ডীর স্তব করতে লাগলো।

কালকেতুকে মুক্তি দেবার জন্যে দেবী চণ্ডী কলিঙ্গ রাজকে স্বপ্নাদেশ দিলেন। দেবীর আদেশে কলিঙ্গ রাজ কালকেতুকে মুক্তি দিয়ে নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কালকেতুর দুঃখ দূর হলো,—পশুকুলও মুক্তি পেলো, এইভাবে সর্বত্র চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হলো।

এর পর পুত্র পুষ্পকেতুকে রাজ সিংহাসন দিয়ে কালকেতু ফুল্লরাকে নিয়ে স্বর্গে গেল। চণ্ডী নিজে শাপমুক্ত নীলাম্বর ও ছায়াকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র আর শচীর কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

॥ প্রশ্নালোচনা ॥

১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কী উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে? এই কাব্যে ক'টি এবং কি কি কাহিনীর উল্লেখ আছে? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত চণ্ডী বিশেষ

করে কাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী? উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে তিনি কখন প্রতিষ্ঠা পেলেন?

২। কালকেতুর কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ।

৩। —'পদ্মার এই উপদেশ চণ্ডীর মনে ধরলো।'—পদ্মার কী উপদেশ চণ্ডীর মনে ধরলো এবং তারপর তিনি কী করলেন?

৪। 'মর্তে গিয়ে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করো'—এখানে কে কাকে এবং কেন একথা বলেছিলেন?

৫। "শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা;
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলা রাতা।"—একথা কে, কা'কে, কখন এবং কেন বলেছিল?

৬। —"ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেন তীর",—এখানে কা'কে বীর বলা হয়েছে? সে ভানু সাক্ষী করে কার উদ্দেশে এবং কেন ধনুকে তীর জুড়েছিলো? তার ফলে কী হলো?

৭। ফুল্লরা তার বারো-মাসের দুঃখ কা'কে, কখন এবং কীভাবে বর্ণনা করেছিলো তা বিশদ ভাবে লেখ।

এবার তোমাদের কাছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনীটি বলছি শোন,—এই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে ধনপতি সদাগর, খুল্লনা আর শ্রীমন্তকে কেন্দ্র করে।

একদিন দেবী চণ্ডী মর্ত্যে তাঁর পুজো আদায় করতে হবে স্থির করলেন। স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালাকে মর্ত্য পাঠাতে

পারলে তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ হয়। তা-ই নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী চণ্ডী কাজে অগ্রসর হলেন।

সুরসভায় নর্তকী রত্নমালার নাচ সুরু হয়েছে। বীণা বাজছে, মৃদঙ্গ ধ্বনিত হচ্ছে; হঠাৎ রত্নমালার তাল ভঙ্গ হলো। এতে রেগে গিয়ে চণ্ডীদেবী শাপ দিলেন, মর্ত্যলোকে মানুষের ঘরে তোকে জন্ম নিতে হবে। চণ্ডীর এই শাপ ব্যর্থ হবার নয়। তা-ই রত্নমালা জন্ম নিলে লক্ষপতি সদাগরের ঘরে। লক্ষপতি মেয়ের নাম রাখলেন খুল্লনা। অতুলনীয় তার রূপ।

উজানী নগরের বিত্তশালী বণিক ধনপতি। তিনি হলেন শিবের ভক্ত। ধনপতির স্ত্রীর নাম লহনা। এই ধনপতি একদিন পায়রা উড়াতে গিয়ে রূপসী খুল্লনাকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হলেন। খুল্লনা জ্ঞাতি সম্পর্কে লহনারই বোন। লহনা নিঃসন্তানা। খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির বিয়ের প্রস্তাব হলে লহনা বিমর্ষ হয়ে পড়লো, স্বামীর ওপর তার অভিমানও হলো খুব। ধনপতি তখন তাকে বোঝালেন যে, খুল্লনাকে তিনি তার (লহনার) রান্নার কাজ করার জন্যে নিযুক্ত করবেন। অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে, একখানা পাটের শাড়ী আর গহনা গড়াবার জন্যে পাঁচ তোলা সোনা দিয়ে সদাগর তাকে (লহনাকে) সন্তুষ্ট করলেন। লহনাও খুশি হয়ে তার আপত্তি তুলে নিলে বেশ জাঁকজমকে বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর একদিন রাজসভায় ধনপতির ডাক পড়লো। রাজার কাছে হাজির হলে রাজা ধনপতিকে বললেন, পিঞ্জর চাই, সোনার পিঞ্জর। ভালো পিঞ্জর পাওয়া যায় গৌড় নগরে। শুক-সারিকে পুষতে হবে, এজন্যে সোনার পিঞ্জর না হলে চলে না। কাজেই রাজার নির্দেশে—'ধনপতি যাও ভায়া গৌড় নগরে'—ইচ্ছে না থাকলেও ধনপতিকে গৌড়ে যেতে হলো। তিনি খুল্লনাকে লহনার কাছে রেখে বলে গেলেন, তার যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

লহনাও স্বামীর কথা মেনে চলে, খুল্লনাকে সে খুবই প্রীতির চোখে দেখে। দুই সতীনের ভেতরে খুবই মিল মিশ। কিন্তু এটা বাড়ির দাসী দুর্বলার সহ্য হয় না। সে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। তাই স্বার্থপরায়ণা দুর্বলা দু'সতীনের মন ভাঙাবার কাজে লেগে যায়। এই কাজে তাকে সাহায্য করে লহনার এক সহচরী—লীলাবতী।

লহনা সরলা, কিন্তু সে বড়োই বোকা। দাসীর কু-পরামর্শে সতীনের প্রতি সে ক্রমেই বিরূপ হয়ে ওঠে। এখন থেকে তার সংকল্প হলো সপত্নীকে সে স্বামীর চোখের বিষ করে তুলবে। তাই দুর্বলার সঙ্গে যুক্তি করে সে স্বামীর জাল-চিঠি খুল্লনার হাতে দেয়। তাতে নির্দেশ ছিলো, খুল্লনা ছাগল চরাবে, ঢেঁকিশালে বাস করবে, দিনে একবেলা আধ পেটা খেতে পাবে, আর 'খুঞা কাপড়' পরবে। খুল্লনা বেশ বুঝতে পারে যে, এই চিঠি জাল; কিন্তু লহনার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে চিঠির নির্দেশ মতোই দিন কাটাতে থাকে।

খুল্লনা ছাগল চরায়। বড়ই দুঃখে তার দিন কাটে। প্রতিদিন ছিন্ন বস্ত্রে, নিরাভরণ দেহে, কদন্ন খেয়ে ছাগল চরাতে যায়। বনের কাঁটায় তার সারা গা কেটে যায়, ছাগল কারো ক্ষেতে ঢুকে পড়লে ক্ষেতের মালিকের গালাগালি শুনতে হয়। সারাদিন পর বাড়ি ফিরলে লহনা ঢেঁকি শালে তাকে মানপাতায় সামান্য জাউ খেতে দেয়; ভাঙা নারকেলের মালায় দেয় জল। ক্ষিদের জ্বালায় খুল্লনাকে তা-ই খেতে হয়। এ ছাড়া তার সারা রাত কাঠে ঢেঁকিশালে।

একদিন ছাগল চরাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে এক বনের ভেতরে সে ঘুমিয়ে পড়লে। চণ্ডীদেবী অসহায় খুল্লনাকে স্বপ্নে মাতৃরূপে দেখা দিয়ে বললেন,—

"কত দুঃখ আছে ঝি তোর কপালে।
সর্বশ্রী ছাগল তোর খাইল শৃগালে॥"

হঠাৎ খুল্লনার ঘুম ভেঙে যায়! জেগে উঠে দেখে, সর্বশ্রী ছাগলটি

নেই। সে ভয়ে ভীত হয়ে ছাগলের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরছে এমন সময় দেখতে পায়, বনের ভেতরে এক জায়গায় কতকগুলি মেয়ে মিলে চণ্ডীদেবীর পুজো করছে। এই মেয়েরা আর কেউ নয়, চণ্ডীদেবীরই অনুচরী বিদ্যাধরীর দল। চণ্ডীদেবী তাদের পাঠিয়েছেন খুল্লনাকে তাঁর পুজো শিখিয়ে দিতে। পাঁচজন বিদ্যাধরী তাকে চণ্ডী পুজো শিখিয়ে দিলে। ভক্তিভরে চণ্ডীর ব্রত গ্রহণ করলে সে তার হারিয়ে যাওয়া ছাগলটির সন্ধান পেলে। চণ্ডী লহনাকে স্বপ্নে আদেশ করলেন, সে যেন খুল্লনাকে আগের মতোই প্রীতির চোখে দেখে, আদর যত্ন করে। লহনা দেবীর আদেশে—অন্ধকার বনপথে খুল্লনাকে ছাগল নিয়ে ফিরতে দেখে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। এই ভাবে দুই বোনের ভেতরে আবার সম্প্রীতি ফিরে আসে।

দীর্ঘদিন পর ধনপতি সদাগর দেশে ফিরে আসেন। রাজাও সোনার পিঞ্জর পেয়ে খুশি হন। তারপর সদাগর বাৎসরিক পিতৃ-শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে থাকেন। শ্রাদ্ধের দিন নিমন্ত্রিত কুটুম্বরা এলে কোনও এক ব্যাপারে তাদের সঙ্গে সদাগরের বিবাদ বাধলে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে খুল্লনার সতীত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে বলে, এতোদিন যে নারী বনে বনে ছাগল চরিয়েছে তার হাতের অন্ন তারা স্পর্শ করবেনা। এজন্য হয় সদাগরকে প্রচুর অর্থ জরিমানা দিতে হবে, না হয় সীতার মতো খুল্লানাকেও তার চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। একথা শুনে ধনপতি এক লাখ টাকা দিয়ে সমাজপতিদের শান্ত করার চেষ্টা করলে খুল্লনা তাঁকে বাধা দিয়ে বললে সে, সে তার সতীত্বের পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত।

তা-ই কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়! চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনা জল পরীক্ষা অগ্নিপরীক্ষা, সর্পপরীক্ষা প্রভৃতি আরো অনেক রকমের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে সমাজপতিদের সন্দেহ দূর করে দেয়। এ ভাবে ধনপতির সংসারে আবার শান্তি ফিরে আসে।

খুল্লনা সুখেই দিন কাটাচ্ছিলো। কিন্তু মানুষের সুখ প্রায়ই বেশি দিন স্থায়ী হয় না। রাজভাণ্ডারে চন্দন, লবঙ্গ, নীল, পলা ইত্যাদির অভাব দেখা দিলে রাজা ধনপতিকে সিংহলে যাবার আদেশ দিলেন। খুল্লনার মন আবার বিষাদে ভরে উঠলো, সতীনের ঘরে আবার যদি কোনও বিপদ হয় এই ভয়ে। কিন্তু ধনপতি তাকে আশ্বাস দিয়ে বাণিজ্যযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। সমুদ্রে ডিঙা ভাসাবার শুভলগ্ন উপস্থিত। স্বামীর মঙ্গল কামনায় ঘট পেতে খুল্লনা চণ্ডী পুজো করতে বসেছে। এমন সময় লহনা এসে ধনপতিকে জানালে যে, খুল্লনা ডাকিনী দেবতার পুজোয় বসেছে। খবর পেয়ে শিবভক্ত ধনপতি রাগ সংবরণ করতে না পেরে মঙ্গলচণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করলেন। সামান্য একজন মানুষের এতোখানি দর্প দেখে চণ্ডীদেবী ভীষণ রেগে গেলেন।

সপ্ত-ডিঙা ভাসিয়ে ধনপতি সিংহল যাত্রা করলেন। পথে ধনপতিকে যথেষ্ট দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হলো। সাগরের প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝায় সপ্ত-ডিঙা মধুকরের ভেতরে ছ'খানা সাগরে ডুবে গেল। একটি মাত্র ডিঙা সম্বল করে ধনপতি সিংহলের দিকে চললেন।

পথে পড়লো কালিদহ। ডিঙা কালিদহে এসে পড়লে শিবভক্ত ধনপতিকে বিপন্ন করার ইচ্ছায় চণ্ডীদেবী অদ্ভুত এক মায়ার সৃষ্টি করলেন! তিনি দেখলেন সাগরের বুকে শতদল একটি পদ্ম ফুটে আছে; তার উপরে বসে এক সুন্দরী নারী একটি হাতিকে ধরে একবার গিলছে, পরক্ষণেই উগ্‌রিয়ে ফেলছে! এই অদ্ভুত দৃশ্যটি একমাত্র ধনপতি ছাড়া মাঝি-মাল্লারা দেখতে পেলে না।

ধনপতি সিংহলে পৌঁছেই রাজদরবারে হাজির হয়ে এই অদ্ভুত 'কমলে কামিনী' দৃশ্যের কথা রাজা শালিবাহনকে বললেন। শালিবাহন তার কথা বিশ্বাস না করায় ধনপতি বললেন,—

"দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকি কারাগারে।
যদি দেখাইতে নারি কামিনী-কুঞ্জরে॥"

ধনপতির কথা শুনে শালিবাহনও বললেন,—

"………যদি সত্য তোমার বচন,
অর্ধরাজ্য দিব আর অর্ধ সিংহাসন।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক অনুসন্ধান করেও ধনপতি সিংহলের রাজাকে কালিদহে সেই 'কমলে কামিণীর' দৃশ্য দেখাতে পারলেন না, ফলে তিনি সিংহলের রাজার কারাগারে বন্দী হলেন।

এদিকে যথাসময়ে খুল্লনার একটি পুত্রসন্তান হলো। এই সুন্দর শিশুটি হলো—শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব মালাধর। চণ্ডীর পুজো প্রচারের জন্যেই তার মর্ত্যে জন্ম। খুল্লনা শিশুটির নাম রাখলো—শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত কৈশোরে পদার্পণ করলে তাকে জনার্দন ওঝার পাঠশালায় লেখাপড়া শেখার জন্যে ভর্তি করে দেওয়া হলো। বিশেষ কোনও কারণে গুরুর বিরাগভাজন হওয়ার জন্যে শ্রীমন্তের আর লেখাপড়া শেখা হলো না।

তারপর ?

তারপর রাজার অনুমতি নিয়ে শুভদিনে শ্রীমন্ত তার মা খুল্লনার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়ে বাবার সন্ধানে সিংহলের দিকে যাত্রা করলো। সমুদ্র যাত্রার সময় খুল্লনা তাকে বলে দিলে, বিপদের সময় চণ্ডীর শরণ নিতে।

বাবার মতো শ্রীমন্তও পথে 'কমলে কামিনী'কে দর্শন করে সিংহলে গিয়ে রাজা শালিবাহনকে এই অদ্ভুত দৃশ্যের কথা বললে। কিন্তু সেও বাবার মতো সিংহলরাজকে ঐ দৃশ্য দেখাতে পারলে না। রাজা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীমন্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

তখন শর্ত অনুযায়ী শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে যাওয়া হলো। এদিকে পুত্রের অমঙ্গল আশংকায় খুল্লনা বাড়িতে পুজোর ঘরে বসে চণ্ডীদেবীকে একমনে স্মরণ করছে। দেবী প্রসন্না হলেন। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে শ্রীমন্ত একমনে চণ্ডীর স্তব করলে। নিজের ভক্ত-উপাসককে সংকট থেকে উদ্ধার করতেই হবে। কোটালের

খড়গ শ্রীমন্তের ঘাড়ের ওপর পড়ে পড়ে এমন সময় দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে মশানে গিয়ে শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে বসলেন। চণ্ডীর ভূত-প্রেতদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজার বহু সৈন্য হেরে গেল, অনেকেই প্রাণ হারালো, বাকি সৈন্যেরা পালিয়ে গেল। রাজা বুঝতে পারলেন, দৈবীশক্তি শ্রীমন্তের সহায়। তখন তিনি নিজে গিয়ে চণ্ডীর পায়ে পড়লেন। দেবী শ্রীমন্তকে কন্যাদান করতে আদেশ দিলেন। দেবীর বরে রাজার মৃত সৈন্যেরা জীবন ফিরে পেলে। শ্রীমন্তের বন্দীদশা ঘুচলো। কারাগারে বন্দী ধনপতি সদাগরও চণ্ডীর আদেশে মুক্তি পেলেন। দীর্ঘকাল পরে পিতা পুত্রের মিলন হলো! সিংহল-রাজ নিজের মেয়ে সুশীলাকে শ্রীমন্তের হাতে তুলে দিলেন।

এবার ধনপতি তাঁর ছেলে, ছেলের বউ আর প্রচুর পণ্য নিয়ে নিজের দেশে যাত্রা করলেন। ফেরার পথে সদাগরের ডিঙা মগরা নদীতে এলে চণ্ডীদেবী কৃপা করে তাঁর জলে ডোবা ছয়টি ডিঙী ফিরিয়ে দিলেন। দেশে ফিরে শ্রীমন্ত রাজা বিক্রমকেশরীকেও 'কমলে-কামিনী'-দৃশ্য দেখালেন। তিনি খুশি হয়ে তাঁর মেয়ে রূপবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিলেন।

এদিকে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো! ভীষণ বিপদের মুখেও ধনপতি এতোদিন দেবীচণ্ডীর কাছে নতি স্বীকার করেননি। একদিন এক আশ্চর্য দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো—শিব পুজো করতে বসে তিনি দেখলেন, তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবের অর্ধাঙ্গ জুড়ে রয়েছেন দুর্গা। তখন ধনপতি বুঝতে পারলেন,—'দুই জনে এক তনু মহেশ-পার্বতী'। শিব আর পার্বতী অভিন্ন জেনে তিনি দেবীর পুজো করলেন। এই ভাবে দেবীচণ্ডীর পুজো দেশের সর্বত্র প্রচারিত হলো।

তারপর ?

তারপর যথা সময়ে শাপভ্রষ্ট দেব-দেবীরা খুল্লনা আর শ্রীমন্ত স্বর্গে ফিরে গেলেন !

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে বাধা নেই যে, 'মনসা মঙ্গলে'র মতো একাধিক কবি চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য কথাকে কাব্যাকারে রচনা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের সবচেয়ে প্রাচীন কবি হলেন মাণিক দত্ত। এ ছাড়া দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য, দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন, জয়নারায়ণ সেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেক কবি চণ্ডীমঙ্গল লিখেছেন; তবে এঁদের ভেতরে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই হলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি। মধ্যযুগে এঁর মতো শক্তিমান কবি বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর একজনও আবির্ভূত হননি বললেও আশাকরি অত্যুক্তি করা হবে না। কারণ দেবতার মাহাত্ম্যের কথা লিখতে বসে মুকুন্দরাম তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের নিত্য পরিচিত লৌকিক সংসারের চারদিকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ইনি সত্যকার মানুষের কবি, কারণ এঁর কাব্যে যে-রস প্রবাহিত হয়েছে তাকে নিঃসন্দেহে 'মানব রস' বলা যায়। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে এঁর জন্ম। মানসিংহের সুবাদারীর (১৫৯৪ খৃঃ) সময় মামুদ শরিফ্ নামে এক শাসনকর্তার অত্যাচারে দেশবাসী উত্যক্ত হয়ে সাত-পুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে অন্য জায়গায় পালিয়ে যায়। সেই সমাজ বিপর্যয়ের দিনে মুকুন্দরামকেও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সাত পুরুষের বাস দামুন্যা ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে। এখানকার জমিদার বাঁকুড়া রায় কবিকে আশ্রয় দেন এবং কবিকে নিজের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘকাল পরে এই রঘুনাথের উৎসাহে আর পৃষ্ঠপোষকতায় মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথই এঁকে কবিকঙ্কণ উপাধি দেন। মুকুন্দরামের রচিত কাব্যের প্রকৃত নাম—'অভয়া মঙ্গল'।

॥ প্রশ্নালোচনা ॥

১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী কাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ? ঐ কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ।

২। ধনপতি সদাগরকে বিদেশে কীভাবে কষ্ট পেতে হয়েছিলো? এই ধরনের কষ্ট পাবার কারণ কী?

৩। ধনপতি সদাগর কালিদহে কীভাবে 'কমলে-কামিনী' দর্শন করেছিলেন তা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ।

৪। শ্রীমন্ত কে? সে কীভাবে তার বাবাকে উদ্ধার করেছিলো?

৫। ধনপতি সদাগর গৌড়ে রওনা হবার পরে লহনা খুল্লনার সঙ্গে কার প্ররোচনায় কী ধরনের ব্যবহার করেছিলো তা সংক্ষেপে লেখ।

৬। সিংহলরাজ শালিবাহন ধনপতি সদাগরকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন কেন? কীভাবে তিনি মুক্তি পান?

৭। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে অন্ততঃ চারজন কবির নাম উল্লেখ করো এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে?

৮। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কে? তাঁর সম্বন্ধে যা জানো সংক্ষেপে গুছিয়ে লেখ।

লাউসেনের কাহিনী...

এবার তোমাদের কাছে ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের কাহিনী বলবো। কাহিনী স্বরু করার আগে ধর্ম-মঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই।

ধর্ম-ঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা অর্থাৎ তাঁর মর্ত্যে পুজো প্রচারের কাহিনী যাতে বর্ণিত হয়েছে তাকেই ধর্মমঙ্গল কাব্য বলা হয়ে থাকে। ধর্ম-ঠাকুর মনসা আর চণ্ডীর মতোই এক প্রাচীন দেবতা। তবে মনে রাখতে হবে যে, ইনি স্ত্রী দেবতা নন, পুরুষ দেবতা। এই দেবতাও অনার্য
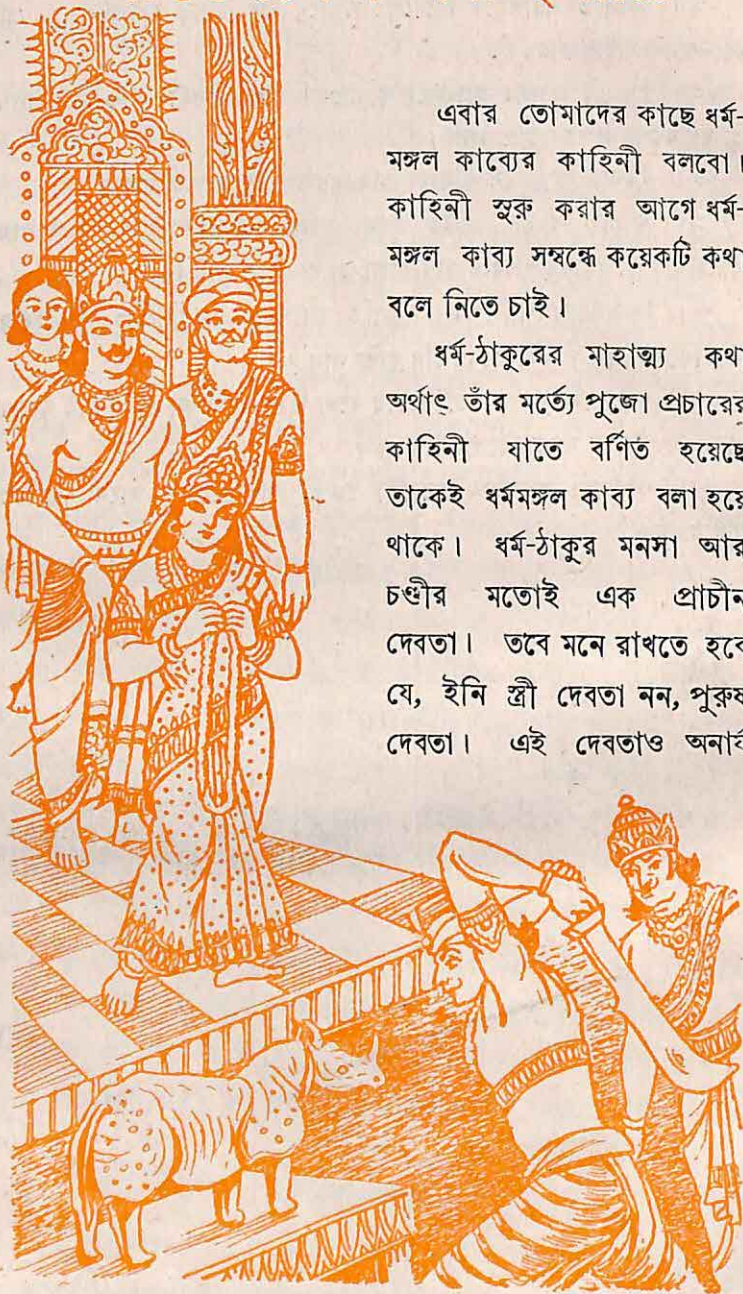
দেবতা ; তবে কালক্রমে এঁর ওপরে আর্যদের ধর্মীয় ভাবনার প্রভাবে আর সমাজ বিবর্তনের মাধ্যমে এঁর রূপান্তর ঘটেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ধর্ম ঠাকুরের পুজো রাঢ় অঞ্চলে অর্থাৎ মধ্য-পশ্চিম বাঙ্‌লায় সীমাবদ্ধ ; বাঙ্‌লা দেশের আর কোথাও ইনি প্রতিষ্ঠা পাননি। ধর্মমঙ্গলের কবিরাও রাঢ়ের (মধ্য-পশ্চিম বাঙ্‌লার) অধিবাসী। এজন্য ধর্মমঙ্গলকে 'আঞ্চলিক সাহিত্য' বলা হয়ে থাকে।

পশ্চিম বাঙ্‌লার নানা জায়গায় দেখা যায়, নীচুবর্ণের হিন্দুরা গাছের তলায়, পুকুর পাড়ে, মাঠের ভেতরে বা মন্দিরে একটি পাথরের খণ্ডকে পুজো করছে। এই পাথরের খণ্ডরূপী দেবতা-ই হলেন ধর্ম রাজ বা ধর্ম-ঠাকুর।

ধর্ম-ঠাকুরের পূজারীরা সাধারণতঃ ডোম জাতির লোক। এই সব পূজারীরা 'পণ্ডিত' উপাধি ব্যবহার করে থাকেন, আর তামার উপবীত (পৈতা) ধারণ করে থাকেন। এই ধর্ম-ঠাকুরের কাছে পুজোর সময় শূকর, ছাগল, হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি পশু-পাখি বলি দেওয়া হয়। সমাজের নানা জাতের লোকে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে ধর্ম-ঠাকুরের কাছে মানসিক করে। এদের গভীর বিশ্বাস, ধর্ম-ঠাকুর জাগ্রত দেবতা, এঁকে পুজো দিলে রোগ-শোক, নানা ব্যাধি আর দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়, এঁর কৃপায় কোনো অকল্যাণ সেবককে স্পর্শ করতে পারে না। শোনা যায়, ধর্ম-ঠাকুরের পুজোয় নাকি কুষ্ঠরোগীও রোগমুক্ত হয়, নিঃসন্তানার সন্তানপ্রাপ্তি ঘটে। তবে মনসা বা চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবতারা হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের কাছে যতোটা মর্যাদা পেয়েছেন, ধর্ম-ঠাকুর কিন্তু ততোটা পাননি। এককালে এই ঠাকুর ছিলেন শুধু ডোম জাতির, ব্রাহ্মণেরা এঁর পুজো সহজে করতে চাইতেন না, এমন কি এঁর মাহাত্ম্যের কথাও লিখতে ভয় পেতেন, আর সে ভয়টা হল জাত-খোয়াবার ভয়।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ধর্ম মঙ্গল কাব্যের পটভূমিতে রাঢ়দেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে, রাঢ়ের অতীত দিনের সমাজ-চিত্র এই কাব্যে শুধু সুন্দর নয়, অনবদ্য রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। এক সময়ে রাঢ়ভূমি ছিলো বাঙ্লা দেশের প্রবেশ পথ। তা-ই এই অঞ্চলের মানুষকে পাঠান, মোগল আর বর্গীর উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে, ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে তাঁদের প্রাণ দিয়ে লড়তে হয়েছে; তাঁদের সেই শৌর্যবীর্যের ছাপ পড়েছে ধর্মমঙ্গলের পাতায়। এ জন্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যকে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বা 'রাঢ়ের বীরগাথা' বলা হয়। মধ্য-যুগের বাঙ্লা সাহিত্যে বাঙালীর যেটুকু শৌর্যবীর্য চোখে পড়ে তা এক মাত্র ধর্মমঙ্গলেই।

ধর্মমঙ্গলের প্রধান কাহিনী হলো ধর্মের বরপুত্র নায়ক লাউসেনের কাহিনী। এ কাহিনী ঠিক ঐতিহাসিক না হলেও এর ভেতরে কিছুটা ঐতিহাসিক সত্য যে লুকিয়ে আছে সে কথা পণ্ডিতেরাও অনুমান করে থাকেন, আর সেই সত্যটি হলো, বাঙ্লায় পাল বংশের রাজত্বকালে সামন্ত রাজাদের ভেতরে যুদ্ধবিগ্রহ। কর্ণসেন আর তাঁর ছেলে লাউসেনের সঙ্গে সোম ঘোষ আর তাঁর ছেলে ইছাই ঘোষের যে যুদ্ধ তা উত্তর রাঢ় আর দক্ষিণ রাঢ়ের দুই সামন্ত রাজের ভেতরে ঘোরতর বিবাদ ছাড়া আর কী হতে পারে?

এবার তোমাদের কাছে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে বলছি শোন,—

ধর্ম-ঠাকুর মর্ত্যে নিজের পুজো প্রচারের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্বর্গে দেবতাদের সভা বসেছে। সেই সভায় নাচের সময় ইন্দ্রের নর্তকী—জাম্ববতীর তালভঙ্গ হলো। ফলে তাকে শাপ দেওয়া হলো,—মর্ত্যে মানুষের ঘরে তাকে জন্ম নিতে হবে।

রমতি নগরের বেণু রায়ের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মালো জাম্ববতী। তার নাম রাখা হলো রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর এক বোন গৌড়ের

রাজার পাটরাণী, আর তার বড়ো ভাই মহামদ হলো গৌড়ের রাজার মন্ত্রী।

রাজা ধর্মপালের ছেলে তখন গৌড়ের রাজা। অশেষ তাঁর প্রতাপ, এ-ছাড়া তাঁর আছে 'নয় লক্ষ সেনা'। রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে রাজ্যে অশান্তি দেখা দেয় অত্যাচারী মন্ত্রী মহামদের জন্যে।

মহামদ আক্রোশে গৌড়ের রাজার একান্ত অনুগত প্রজা সোম ঘোষকে বিনা দোষে কারাগারে বন্দী করলো। গৌড়ের রাজা তাকে কারা মুক্ত করে ত্রিষষ্ঠী গড়ের সামন্ত রাজ কর্ণ সেনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সোম ঘোষের ছেলে ইছাই ঘোষ পার্বতীর দয়ায় অসাধারণ বীর হয়ে উঠলো; বনজঙ্গল কেটে অজয় নদীর তীরে সে একটি দুর্গ তৈরি করলো। এই বার কর্ণসেনকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নিজেই স্বাধীন রাজা হয়ে বসলে, আর গৌড়ের রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করে দিলে। ইছাই নিজের গড়ের নাম রাখলে ঢেকুর। ফলে যুদ্ধ হলো, যুদ্ধে কর্ণসেনের ছ' ছেলে নিহত হলো। পুত্রশোকে তাঁর বউও মারা গেলেন। কর্ণসেন তখন কী আর করেন! দুঃখে শোকে আধমরা অবস্থায় গৌড়ের রাজার শরণাপন্ন হলেন।

বুড়ো কর্ণসেনের এই দুর্দশা দেখে তাঁকে আবার সংসারী করার জন্যে রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে গৌড়ের রাজা নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু মহামদ এই প্রস্তাবে রাজি না থাকায় তার বিনা উপস্থিতিতেই রাজা এই বিয়ে দিয়ে কর্ণসেন আর রঞ্জাবতীকে ময়না গড়ে পাঠিয়ে দিলেন। মহামদ পরে এ কথা জানতে পেরে হিংসায় সব সময় কর্ণসেনের অনিষ্ট চিন্তা করতে লাগলো।

বিয়ের কিছুদিন পরে রঞ্জাবতীর অনুরোধে কর্ণসেন শ্বশুর বাড়ির খবর নেবার জন্যে গৌড়ে গেলেন। সেখানে মহামদ কর্ণসেন আর রঞ্জাবতীর ছেলে না থাকার কথা উল্লেখ করে তাঁকে যথেষ্ট অপমান

করলো। শ্যালকের কাছে এভাবে অপমানিত হয়ে দুঃখিত মনে কর্ণসেন ময়না গড়ে ফিরে এলেন। স্বামীর মুখে সব কথা শুনে রঞ্জাবতী পুত্র লাভের আশায় নানা দেবদেবীর কাছে পুজো মানসিক করলেন। শেষে মামুলার উপদেশে 'শালে ভর দিয়া' কঠোর কৃচ্ছ-সাধন করে ধর্ম-ঠাকুরের দয়ায় লাউসেন নামে এক অদ্বিতীয় বীর পুত্র লাভ করলেন। লাউসেনের সহচর হিসেবে কর্পূর সেন নামে আরো একটি পুত্র সন্তান রঞ্জাবতীকে ধর্ম-ঠাকুর দান করলেন। ধর্ম-ঠাকুরের আদেশে মহাবীর হনুমান এই দু' ভাইকে মল্লবিদ্যা শেখালেন। ধর্ম-ঠাকুরের ভক্ত লাউসেন বিদ্যায় বুদ্ধিতে, গুণে চরিত্রে আর সংযমে সকলের শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন। পার্বতী স্বয়ং লাউসেনের পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে জয় খড়গ উপহার দিলেন।

এবার মা-বাবার আদেশ নিয়ে রাজসভায় নিজের শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেবার জন্য লাউসেন গৌড়ের দিকে রওনা হলেন, তাঁর সঙ্গে গেলেন তাঁর একমাত্র ভাই কর্পূর সেন। লাউসেনকে পথেই বিকলাঙ্গ করে দেবার জন্যে মহামদ আটজন কুস্তিগীরকে পাঠালেন, কিন্তু তারা সকলেই লাউসেনের কাছে হেরে গেল। তারপর পথের ভেতরে একটি কেঁদো বাঘ আর একটি কুমীরকে বধ করে লাউসেন গোলঘাটে পৌঁছুলেন। সেখান থেকে সুরিক্ষার ছলনা থেকে রক্ষা পেয়ে গৌড়ে হাজির হলেই মহামদ কৌশলে রাজার পাট হাতি চুরির অপরাধে লাউসেনকে বন্দী অবস্থায় রাজসভায় হাজির করলো। গৌড়ের রাজা বন্দীর মুখ থেকে তাঁর পরিচয় জানতে পেরে খুশি হয়ে ময়না তালুক আর অনেক উপহারে তাঁকে সম্মানিত করলেন। কিছুদিন সম্মানের সঙ্গে গৌড়ে থাকার পর দেশে ফেরার পথে বীর কালু ডোমের সঙ্গে লাউসেনের পরিচয় হয়। তিনি জানতে পারেন যে, রাজমন্ত্রীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কালু ডোম তার পরিবারের সকলকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। লাউসেন তাদের সঙ্গে নিয়ে ময়নায় ফিরে এলেন এবং রাজধানীর পশ্চিম অংশ

ডোমেদের বাস করার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিলেন। এছাড়া তিনি কালু ডোমকে তাঁর নগররক্ষকের পদে নিযুক্ত করলেন, ফলে ডোম-বাহিনী তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে রাজধানীর পশ্চিম দিকে সুখে আর শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো।

আগেই বলেছি, গৌড়ের রাজমন্ত্রী মহমদ সব সময়েই লাউসেনের অনিষ্ট করার জন্য সচেষ্ট। তা-ই মহামদেরই কুমন্ত্রণায় গৌড়রাজ লাউসেনকে কামরূপ রাজ্য জয় করে দেবার জন্যে আদেশ করলেন। রাজার আদেশে লাউসেন বিনা দ্বিধায় কালু ডোমকে সঙ্গে নিয়ে কামরূপে গিয়ে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে কামাখ্যাদেবী-রক্ষিত কামরূপ রাজ্য জয় করে নিলেন। কামরূপের রাজা পরাজিত হয়ে তাঁর সুন্দরী মেয়ে কলিঙ্গাকে লাউসেনের হাতে তুলে দিয়ে সন্ধি করলেন। এ-ভাবে মহামদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো। এরপর গৌড় হয়ে ময়নায় ফেরার পথে অমলা আর বিমলা নামে আরও দু' রাজ-কন্যাকে লাউসেন বিয়ে করেন।

সিমুলার রাজা হরি পালের কানাড়া নামে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিলো। মন্ত্রী মহামদের কুপরামর্শে গৌড়ের রাজা কানাড়াকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কানাড়া ছিলো দেবীর ভক্ত; দেবী একটি লোহার গণ্ডার দান করে বলেছিলেন,—যে বীর এক কোপে এই গণ্ডারের মাথা কাটতে পারবে একমাত্র সে-ই কানাড়াকে বিয়ে করবে। গৌড়রাজ বা মাহমদ কেউই গণ্ডারের মাথা কাটতে পারলেন না। তখন মহামদের উপদেশে গৌড়ের রাজা লাউসেনকে ডেকে পাঠালেন, উদ্দেশ্য হলো, যদি লাউসেন এ-কাজ করতে না পারেন তা হলে তিনি অপমানিত হবেন, আর পারলে গৌড়ের রাজা কানাড়াকে বিয়ে করবেন।

লাউসেন এক কোপে লোহার গণ্ডারের মাথাটি কেটে ফেলায় কানাড়া তাঁর-ই গলায় বরমাল্য দিলেন। গৌড়ের রাজা হতাশ হয়ে লজ্জায় আর অপমানে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

এবারে মহামদের পরামর্শ মতো গৌড়ের রাজা লাউসেনকে পাঠালেন ঢেকুরে দেবীর কৃপায় পুষ্ট ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্য। লাউসেন তাঁর ডোম সহচর নিয়ে অজয় নদীর তীরে ঢেকুরে হাজির হয়ে ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন। তুমুল যুদ্ধ হলো, যুদ্ধের পরে দৈব বলে বলীয়ান লাউসেন ইছাই ঘোষকে পরাজিত আর নিহত করে পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিলেন।

কোনওভাবেই লাউসেনকে জব্দ করা গেল না; অবশেষে গৌড়ের রাজা আর মহামদ যুক্তি করে লাউসেনকে আদেশ করলেন যে, তাঁকে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় দেখাতে হবে। এই অসাধ্য সাধনের জন্যে লাউসেন হাকন্দে গিয়ে ধর্ম-ঠাকুরের তপস্যা সুরু করলেন।

লাউসেনের এই অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ ময়না গড় আক্রমণ করলো। কালু ডোমকে লোভ দেখিয়ে মহামদ তাকে বশ করেছিলো, তা-ই সে যুদ্ধে গেল না। কালুর বউ লখ্যা শত্রু-সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করলো, যুদ্ধে তার ছেলে নিহত হলো। তখন পুত্র শোকাতুরা লখ্যা কালুকে যুদ্ধে পাঠালে, তাকে উদ্দীপিত করার জন্যে সে বললে,—

"পুত্র শোকে জয়দ্রথ বধিলা অর্জুন।
তোর সম পিতা নাথ না দেখি দারুণ॥
কি লয়ে সংসারে আর কার মুখ চাও।
সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও॥"

কিন্তু দুঃখের বিষয় কালু বীর যুদ্ধে মারা গেল। তার পরে কলিঙ্গা যুদ্ধ করতে গেলে তারও মৃত্যু হলো। শেষে কানাড়ার হাতে পরাজিত হয়ে মহামদ পালিয়ে গেল।

এদিকে লাউসেন হাকন্দে কঠোর তপস্যায় রত, দেহের মাংস কেটে তিনি হোম করলেন। শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে মাথা কেটে আগুনে আহূতি দিলেন। তার এই কঠিন তপস্যায় খুশি হয়ে ধর্ম-

ঠাকুর পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় দেখালেন—ভক্তেরও মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

তারপর ?

তারপর ধর্ম-ঠাকুরের কৃপায় কলিঙ্গা, কালু ডোম আর তার ছেলে বেঁচে উঠলো। মহামদ তার পাপ কাজের জন্যে ঠাকুরের অভিশাপে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলো ; পরে লাউসেনের অনুগ্রহে সে এই ভীষণ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেলো।

আর লাউসেন ?

লাউসেন নিশ্চিন্ত মনে সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলেন। শেষে তিনি তাঁর ছেলে চিত্রসেনের হাতে রাজ্য ভার দিয়ে মায়ের সঙ্গে স্বর্গলোকে চলে গেলেন। এই ভাবে ধর্ম-ঠাকুরের পুজো মর্ত্যে প্রচারিত হলো।

যেমন মনসামঙ্গলের, যেমন চণ্ডীমঙ্গলের, তেমন-ই ধর্মমঙ্গলের কবিও সংখ্যায় কম নন। এই কবি গোষ্ঠীর ভেতরে রয়েছেন সমাজের নানা স্তরের মানুষ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত এবং শুঁড়ি। তবে ধর্মমঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের ভেতরে বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ।

ধর্মমঙ্গলের আদি কবি হলেন ময়ূর ভট্ট। এ-ছাড়া রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিক রাম, সীতারাম আর সহদেবের নামও উল্লেখ করার মতো। তবে ধর্মমঙ্গলের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি হলেন—ঘনরাম চক্রবর্তী। এঁর বাড়ি ছিলো বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে। এঁর শিক্ষাগুরুই এঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করে ছিলেন এঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে। মনে হয়, বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আদেশে ইনি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ইনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এঁর কবিত্ব শক্তিও সর্বজন স্বীকৃত। এই কবির কাব্যরীতি পরবর্তী যুগের কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যরীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। কবি ঘনরামের কাছে কবি ভারতচন্দ্র যে কিছুটা ঋণী এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

॥ প্রশ্নালোচনা ॥

১। ধর্মমঙ্গলকাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলা হয় কেন ?

২। লাউসেনের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ।

৩। রঞ্জাবতী কে ? তিনি কী ভাবে পুত্র লাভ করেন ?

৪। কোথায় এবং কখন লাউসেনের সঙ্গে কালু ডোমের পরিচয় হয় ? কী ভাবে কালু ডোম মারা যায় ?

৫। ঢেকুরের গড় কোথায় ? এই গড় কে তৈরী করেন ? কী ভাবে তিনি রাজা হয়েছিলেন ? কার হাতে তাঁর মৃত্যু হয় ?

৬। মহামদ লাউসেনের অনিষ্ট করার জন্যে কী কী উপায় করেছিলো ? তার সব প্রচেষ্টা কী ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো ?

৭। লাউসেনের বীরত্বের অসাধারণ ঘটনাগুলি সংক্ষেপে লেখ।

৮। ধর্মমঙ্গলকাব্যের আদি কবি কে ? ধর্মমঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করো এবং তাঁদের ভেতরে সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি কে ? তাঁর সম্বন্ধে যা জানো সংক্ষেপে লেখ।

দেবতাদের মধ্যে তিনজন প্রধান—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। মহেশ্বর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁরই আর এক নাম শিব। শিব অল্পে সন্তুষ্ট, এমনিতে শান্ত শিষ্ট—কিন্তু একবার চটে গেলে তখন সব কিছু ধ্বংস করে দেন। এই শিবের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল প্রজাপতি দক্ষরাজের মেয়ে সতীর।

দক্ষ বিরাট ধনী রাজা। কপর্দকহীন শিবকে তাই তিনি পছন্দ করতেন না। শিবও তাঁর শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতিকে সম্মান দেখাতে চাইতেন না। একবার স্বর্গে দেবতাদের সভায়

দক্ষও গিছলেন। সেখানে শিব তাঁকে সম্মান না করায় প্রজাপতি দক্ষ ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন। স্থির করলেন, এর শোধ তিনি তুলবেন। এর কিছুদিন বাদে দক্ষ এক বিরাট যজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন। যজ্ঞে সব দেবতাকে আমন্ত্রণ জানানো হল; বাদ দেওয়া হল শুধু দেবাদিদেব মহাদেবকে। শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, তবু বাপের বাড়ীতে এত বড় যজ্ঞ হচ্ছে তাই সতী সেখানে বিনা নিমন্ত্রণেই যেতে চাইলেন। শিব অনেক করে বারণ করলেন কিন্তু সতী শুনলেন না।

প্রজাপতি দক্ষের বাড়ীতে বিরাট যজ্ঞ হচ্ছে। সেখানে প্রচুর দেবতারা এসেছেন। সতী সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে সেখানে সতী শুনলেন, দক্ষ সকলের সামনে শিবের নিন্দা করছেন। স্বামীর নিন্দা শুনে সতীর দুঃখ হলো, অপমান হলো। পতিব্রতা সতী সে নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করলেন। সতী দেহত্যাগ করেছেন এবং তার জন্য দায়ী দক্ষ প্রজাপতি একথা শুনে শিব একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তিনি তার সাঙ্গোপাঙ্গ নন্দীভৃঙ্গী এবং অন্যান্য ভূতপ্রেতদের নিয়ে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গিয়ে তাণ্ডব শুরু করে দিলেন। সমস্ত পৃথিবী আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠ্‌লো। যজ্ঞ একেবারে পণ্ড হয়ে গেল। শিব সতীর শব কাঁধে নিয়ে উন্মত্তের মতো বেরিয়ে গেলেন।

সতী পরজন্মে আবার জন্মালেন গিরিরাজের স্ত্রী মেনকার মেয়ে হয়ে। তাঁর নাম হলো গৌরী। গৌরী ছোটবেলা থেকেই শিবের সাধনা করেন। যতদিন যেতে লাগল ততই শিবকে স্বামী হিসাবে পাবার জন্য তাঁর কামনা বাড়তে লাগল। গৌরী রাজার মেয়ে, আদর যত্নে বিলাসের মধ্যে মানুষ। আর শিব নিঃস্ব, তাঁর কোন ধনসম্পদ নেই। ভিখারীর মতো তিনি ঘুরে বেড়ান শশ্মানে মশানে। তবু তাঁকেই গৌরী বিয়ে করবেন। তাই গিরিরাজ আর কি করেন? দেবর্ষি নারদের উপদেশে তিনি শিবের সঙ্গেই বিয়ে দিলেন রাজকন্যা গৌরীর।

বিয়ের পর গৌরী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে স্বামীর কুঁড়ে ঘরে বাস করতে গেলেন। গৌরী সংসার তো পাতলেন। কিন্তু সংসার চলবে কি করে? শিব অতি দরিদ্র। তাঁর সঞ্চয় সামান্যই। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে সঞ্চয় ফুরিয়ে গেল। তখন অনাহার ছাড়া আর গতি নেই। শিব সংসারবিরাগী—অন্নসংস্থানের কোন পথও তিনি খুঁজে পেলেন না। তখন গৌরী শিবকে পরামর্শ দিলেন, মর্তে গিয়ে কৃষিকার্য করার জন্যে। বললেন,

"চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন।
চাষ চষ বারেক বর্তুক পরিজন॥
পরিজন পোষে চাষী সুখে সাধু রাজা।
লক্ষ্মী পোষি চাষী করে সবাকারে তাজা॥"

চাষবাস করলে ফসল হবে, কোন অভাব অনটন থাকবে না। কিন্তু শিব ভারী অলস! চাষ করতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। তিনি তাই সহজে রাজী হলেন না। বললেন, "চাষ করে কি হবে? সব বছর ফসল ভাল হয় না। এরকম অনিশ্চিত কাজের ওপর নির্ভর করা কি ঠিক? তার চেয়ে বরং ব্যবসা-বাণিজ্য করা ভাল।" কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে পুঁজি দরকার। সেটা আসাবে কোথা থেকে? শেষ পর্যন্ত তাই শিব চাষ করতে রাজী হয়ে গেলেন।

এখন চাষের জমি দরকার। দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে কিছু জমির বন্দোবস্ত নেওয়া হলো। এর পর শিব নিজের ত্রিশূলটি বিশ্বকর্মাকে দিয়ে বললেন, "এটি থেকে লোহা নিয়ে চাষের যন্ত্রপাতি তৈরী করে দাও।" বিশ্বকর্মা ত্রিশূলের লোহা গলিয়ে চাষের যন্ত্রপাতি তৈরী করে দিলেন। এবার দরকার বীজধানের। শিব গৌরীকে বললেন, "যাও, কুবেরের কাছে গিয়ে কিছু বীজ ধান ধার করে নিয়ে এসো।" কিন্তু গৌরী তাতে রাজী হলেন না। তখন শিব নিজেই কুবেরের কাছ থেকে বীজ ধান ধার করে আনলেন। ফসল উঠলেই সে ধার শোধ করে দেবেন এই কড়ারে।

যথাসময় খুব ভাল বৃষ্টি হলো। শিব তাঁর অনুচর ভীমকে নিয়ে জমিতে লাঙল দিলেন, মই দিলেন, ধান রোপন করলেন। কত রকম বেরকমের ধান—

"খেজুরথুপী খয়েরশালী ক্ষেম গঙ্গাজল।
গয়ার বালি, গোপালভোগ, গৌরী কাজল॥"

তারপর যথা সময় ধান পাকালো, ধান কাটা হলো। নারদের কাছ থেকে ঢেঁকি ধার করে এনে শিবের অনুচর ভীম ধান ভেনে দিল। গোলা ভরা ধান, তাই গৌরীর সংসারে আর কোন অভাব-অনটন রইল না!

কিন্তু শিব কৃষিকার্যে এমন মেতে উঠলেন যে, কৈলাসে ফিরে যাবার কথা আর তাঁর মনেই রইল না। শিবকে কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গৌরী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নানাভাবে তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। শিবকে জ্বালাতন করার জন্য তিনি মশা, মাছি, জোঁক ইত্যাদি পাঠাতে লাগলেন। কিছুতেই কিছু হলো না। শিব গায়ে ঘি মেখে সে সবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। তিনি কৃষিকাজে এত ব্যস্ত যে, গৌরীর কথাও তিনি ভুলতে বসেছেন।

গৌরী তখন এক বাগ্‌দী মেয়ের রূপ ধরে শিবের জমির কাছে গিয়ে মাছ ধরতে লাগলেন। বাগ্‌দী মেয়ের ছদ্মবেশে গৌরীকে শিব চিনতে পারলেন না। তিনি মেয়েটির রূপলাবণ্য দেখে এমনই মুগ্ধ হলেন যে, তাকে বিয়ে করতে চাইলেন। মেয়েটি একটি শর্তে রাজী হলো—তিনি যেখানে যাবেন, শিবকেও সেখানেই যেতে হবে। শিব আর কি করেন! তাতেই রাজী হয়ে চললেন—গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে।

গৌরী এলেন কৈলাসে। এসে বাগদী মেয়ের ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। গৌরী তিরস্কার করতে লাগলেন শিবকে। শিব লজ্জায় পড়ে গেলেন!

এমন সময় সেখানে এলেন দেবর্ষি নারদ। গৌরী নারদকে সবকথা খুলে বললেন। নারদ গৌরীকে পরামর্শ দিলেন শিবের কাছ থেকে এক জোড়া শাঁখা চাও। কিন্তু শিব গরীব-নিঃস্ব। শাঁখা দিতে পারলেন না। গৌরী অভিমানে চলে গেলেন বাপের বাড়ীতে। শিব মনের দুঃখে একলা দিন কাটাতে লাগলেন কৈলাসে।

এমন সময় একদিন নারদ এসে শিবকে বললেন, "গৌরী একদিন তোমার কাছ থেকে এক জোড়া শাঁখা চেয়েছিল। তুমি দিতে পারনি বলে অভিমানে সে বাপের বাড়ী চলে গেছে! তুমি এখন শাঁখারির বেশে হিমালয়ে যাও, গৌরীকে নিজের হাতে শাঁখা পরিয়ে দাও। তাহলেই সে আবার ফিরে আসবে।"

শিব তখন শাঁখারির বেশে যাত্রা করলেন। তখন দুর্গা পূজার সময়। গিরিরাজের বাড়ীতে মহাধূমধামের সঙ্গে দুর্গা পূজা হচ্ছে। চারিদিকে অনেক লোকজন। ছদ্মবেশী শিব সেখানে গিয়ে হাজির হলেন, কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না।

গৌরী খবর পেলেন, একজন শাঁখা বেচতে এসেছে। তাঁর শাঁখা পরার সখ অনেকদিনের। তিনি এসে শাঁখা পরে জিজ্ঞাসা করলেন, শাঁখার দাম কত?

ছদ্মবেশী শিব বললেন, শাঁখার দাম আত্মসমর্পন।

এই উত্তর থেকেই গৌরী বুঝতে পারলেন, শাঁখারি ছদ্মবেশী শিব ছাড়া কেউ নন। শিবের হাত থেকে শাঁখা পেয়ে তাঁর সব অভিমান দূর হলো। তিনি শিবের সঙ্গে ফিরে গেলেন কৈলাসে। সেখানে তাঁরা সুখেশান্তিতে সংসার করতে লাগলেন।

শিবের কৃষিকর্মের এই কাহিনী আছে শিবমঙ্গলে। শিবমঙ্গলের ছড়া কৃষকসমাজের মধ্যে বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এগুলি লেখার আকারে পাওয়া যায়। দ্বিজ কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র প্রভৃতি শিবমঙ্গল রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

॥ প্রশ্নালোচনা ॥

১। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা কে? তাঁর সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছিল?

২। দক্ষ তাঁর যজ্ঞ সভায় শিবকে আমন্ত্রণ করেন নি কেন? সতী কেন দেহত্যাগ করেছিলেন?

৩। সতীর দেহত্যাগের সংবাদে শিব কি করেছিলেন?

৪। সতীর পরজন্মে নাম কি হয়েছিল? তিনি কার মেয়ে হয়ে জন্মেছিলেন? তাঁর পিতার নাম কি ছিল?

৫। গৌরী কেন শিবকে কৃষিকর্ম করতে বলেছিলেন? শিব প্রথমে তাতে রাজী হন নি কেন?

৬। গৌরী কেন অভিমানে বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিলেন? শিব কি ভাবে তাঁকে আবার কৈলাসে ফিরিয়ে এনেছিলেন?

রুমুনা-ঝুমুনার কাহিনী

দেবদেবীদের মহিমা কীর্তন এবং তাঁরা কি করে মর্তে তাঁদের পুজো প্রচার করলেন তার কাহিনীগুলি নিয়েই মঙ্গলকাব্যগুলি লেখা। মনসা দেবীর মহিমা প্রচারের জন্য মনসামঙ্গল, চণ্ডীদেবীর মহিমা প্রচারের জন্য চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারের জন্য ধর্মমঙ্গল, অন্নপূর্ণার মহিমা প্রচারের জন্য অন্নদামঙ্গল, শিব ঠাকুরের মহিমা প্রচারের জন্য শিবমঙ্গল লেখা হয়েছিল। তেমনি সূর্যদেবের মহিমার কাহিনী হলো সূর্যমঙ্গল। রুমুনা-গল্প আছে এই সূর্যমঙ্গলে। এবার ঝুমুনার রুমুনা-ঝুমুনার কাহিনীটা শোনো।

সে অনেক দিন আগের কথা। বাংলাদেশের এক গ্রামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণ বড়ো গরীব—তাঁর দিন চলা দায়। এদিকে আবার ব্রাহ্মণী দুটি মেয়ে রেখে মারা গেছেন আগেই। মেয়ে দু'টির নাম রুমুনা আর ঝুমুনা। এই মেয়ে দু'টিকে মানুষ করতে হয় এতো দারিদ্র্যের মধ্যে। ব্রাহ্মণের তাই কষ্টের আর সীমা নেই। বুড়ো মানুষ—তবু ব্রাহ্মণকে রোজই ভিক্ষায় বার হতে হতো। সকাল বেলাতেই ভিক্ষায় বেরুতেন। এ গাঁ সে গাঁ করে নানা গাঁয়ে ঘুরে ভিক্ষা জোগাড় করতে করতে অনেক দিনই সন্ধ্যা হয়ে যেত বাড়ী ফিরতে।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে কষ্টেস্‌ষ্টে রুমুনা আর ঝুমুনা বড় হয়ে উঠ্‌ল। তারা দেখত বাবার ভারি কষ্ট। তাই ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করতে বেরিয়ে যাবার পর তারা গাঁয়ের পুকুর, খাল, বিলে যেত শাক তুলতে। তাতে তো কিছু খাবার জোগাড় হবে! ব্রাহ্মণ বাড়ী ফেরার আগেই তারা ফিরে আসতো শাক তুলে। এইভাবে কোন রকমে শাক ভাত খেয়ে দিন কাটত তাদের।

তারা যে গাঁয়ে বাস করতো সেই গাঁয়ের শেষে ছিল একটা বন। সে বনে জলা জমি ছিল অনেক, তাতে শাকও হতো প্রচুর। রুমুনা-ঝুমুনা দু' বোন মাঝে-মধ্যে সেই বনেও যেত বেশী করে শাক নিয়ে আসতে। একদিন হয়েছে কি, রুমুনা-ঝুমুনা সেই বনের মধ্যে গেছে শাক তুলতে। শাক তুলতে তুলতে দুপুর হয়ে গেছে। গরম কাল। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে দু বোন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে বসল একটা গাছ তলায়।

হঠাৎ তারা অবাক হয়ে গেল। একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে কয়েকজন মেয়ে খুব ভক্তিভরে পুজো করছে যেন কাকে। মেয়েগুলি দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। এমন সুন্দরী নিখুঁত মেয়ে তারা আর কখনো দেখেনি। দিব্যজ্যোতি বেরুচ্ছে যেন তাদের সর্বাঙ্গ দিয়ে। পৃথিবীর কোন মানুষের ক্ষেত্রে তো এমন দেখা যায় না।

এরা কে তবে ? রুমুনা-ঝুমুনা ভয়ে ভয়ে মেয়েগুলির কাছে এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইল, তারা কে ? এই গভীর বনের মধ্যে তারা কি করছে ?

মেয়েরা জানালো, তাঁরা মানবী নন, তাঁরা দেবকন্যা। এখানে এসে সূর্যদেবের পুজো করছেন। কিন্তু তোমরা কারা ?

রুমুনা-ঝুমুনা তখন তাদের নিজেদের পরিচয় দিল। তাদের সব দুঃখকষ্টের কথা বলল দেবকন্যাদের। দুই বোনের দুঃখের কাহিনী শুনে দেবকন্যাদের ভারী দয়া হলো। তাঁরা বললেন, তোমরাও আমাদের মতো সূর্যদেবের পুজো করো। তোমাদের দুঃখকষ্ট আর থাকবে না। কি করে সূর্যের স্তব করতে হবে তাও তাঁরা শিখিয়ে দিলেন।

দুই বোন তখন সেই বনের মধ্যেই পুজো করতে লাগল সূর্যদেবকে। পুজো করতে করতে তাদের কোন দিকে কিছু খেয়ালই রইল না। তাদের ভক্তি দেখে শেষে সূর্যদেবের দয়া হলো। তিনি স্বয়ং সেখানে এসে তাদের বর দিলেন। বললেন, আমি তোমাদের বর দিলাম। এই বরে তোমাদের সব অভাব, দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে।

তারপর রুমুনা-ঝুমুনা নিজেদের বাড়ীতে ফিরে এলো। এসেই তো অবাক ! কোথায় সেই ছোট্ট কুঁড়ে ঘর ? তার জায়গায় রয়েছে বিরাট এক প্রাসাদ। সেই প্রাসাদে রয়েছে কত দাস দাসী, কত জিনিস পত্র থৈ থৈ করছে চারদিকে। তারা বুঝতে পারল, সূর্য-দেবের বরেই এসব কিছু হয়েছে। তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও ভিক্ষা সেরে বাড়ী ফিরে এ সব কাণ্ড কারখানা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তখন রুমুনা-ঝুমুনা বাবাকে সব বলল, কেমন করে তারা বনের মধ্যে সূর্যদেবতার বর পেয়েছে, তারপর কি কি ঘটেছে। ব্রাহ্মণ খুব খুশি হলেন। এবার তবে পেট পুরে তারা সব খেতে পাবেন, আর তাঁকে ভিক্ষা করতে যেতে হবে না গাঁয়ে গাঁয়ে।

এদিকে হয়েছে কি সেই রাজ্যের রাজার একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির বিয়ের বয়স হয়েছে—কিন্তু তখনো বিয়ে হয় নি। রাজাও মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য বিশেষ গা করেন না। একদিন রাণী খুব চটে গিয়ে রাজাকে ভীষণ বকাঝকা করলেন। রাজা তখন প্রতিজ্ঞা করলেন, কাল সকালে উঠে রাজবাড়ীর বাইরে যার মুখ দেখবো তার সঙ্গেই বিয়ে দেবো রাজকন্যার।

রাজার এই প্রতিজ্ঞার কথা সূর্যদেবও জানতে পারলেন। তিনি রাত্রি বেলা রুমুনা-ঝুমুনাকে স্বপ্ন দিলেন, ভোর না হতে হতেই তারা যেন তাদের বাবাকে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। সূর্যদেবকে দু'বোন খুব ভক্তি করত, তাই তারা জানতে চাইল না কেন তিনি এ কথা বলছেন। নিশ্চয় কোন কারণ আছে এর।

রুমুনা-ঝুমুনার কথা মত ব্রাহ্মণ ভোর না হতে হতেই হাজির হলেন রাজপ্রাসাদের সামনে। রাজা সকালে যেই না বাইরে বেরিয়েছেন অমনি দেখলেন, সামনে এক ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর যে-কথা সেই কাজ। তিনি ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিলেন রাজ-কন্যার। ব্রাহ্মণ বিয়ে-থার পাট চুকে যাবার পর রাজকন্যাকে নিয়ে ফিরে এলেন নিজের বাড়ীতে। রুমুনা-ঝুমুনা নতুন মা পেয়ে খুব খুশি হলো।

কিন্তু রুমুনা-ঝুমুনা খুশি হলে কি হবে,তাদের সৎমা ঐ রাজকন্যা কিন্তু দু' বোনকে মোটেই ভাল চোখে দেখলেন না। রোজই তিনি ঝগড়া করেন তাদের সঙ্গে সামান্য কারণ নিয়ে। বিশেষ করে সূর্যপূজা তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তিনি দু' বোনের জীবন একেবারে বিষময় করে তুললেন। কিন্তু তাতেও খুশি না হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে বললেন, ওদের তাড়িয়ে দাও বাড়ী থেকে। ব্রাহ্মণ প্রথমে কিছুতেই রাজী হলেন না। শেষে নতুন বৌ-এর ঝগড়া-ঝাটিতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বললেন, ঠিক আছে, আমি ওদের মাসির বাড়ীতে রেখে আসব। ব্রাহ্মণ এই কথা বলে মেয়েদের

নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। রুমুনা-ঝুমুনার কোন মাসি ছিল না। তবু তারা বাপের সঙ্গে চলল, কোন কথা বলল না।

তারা তিন জন সারাদিন ধরে হাটতে হাটতে শেষে ক্লান্ত হয়ে বনের ধারে এক গাছের তলায় এসে বসল। দু' বোন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো যে গাছের তলায় বসে একটু পরেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ দেখলেন মেয়েরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তিনি একটু পরে তাদের সেখানে ফেলে রেখে একা ফিরে এলেন বাড়ীতে।

এদিকে অনেক রাতে ঘুম ভাঙল রুমুনা-ঝুমুনার। চোখ মেলে তারা দেখল, চারদিকে গভীর বন; ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। তাদের বাবা কোথাও নেই। তারা বুঝতে পারল বাবা তাদের বনের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন। এখন তারা কি করবে? এই বনের মধ্যে, যে-কোন সময় হিংস্র সব জন্তু জানোয়ার এসে হাজির হতে পারে। তখন আর রক্ষা থাকবে না। সুতরাং তারা একটা আশ্রয়ের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু কোথায় আশ্রয় পাবে? গভীর গহন বন, কোথাও লোকজন নেই, বাড়ীঘর নেই—কে দেবে আশ্রয়? শেষে একটা অশত্থ গাছের কাছে গিয়ে তারা বলল—"হে অশত্থ গাছ, আমাদের ভারী বিপদ। তুমি আমাদের একটু আশ্রয় দাও।" অশত্থ গাছ তখন তার ডালপালা গুলো নামিয়ে দিল। দু' বোন একটা ডালের উপর বসল আর অমনি ডালগুলো আবার উঠে গেল উপরে। সে রাত রুমুনা-ঝুমুনা কাটালো সেই অশত্থ গাছের ডালে।

পরের দিন সকাল হলো। দু' বোন নামল গাছের ডাল থেকে। কিন্তু এখন তারা যাবে কোথায়? তাদের আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, বাড়ীতেও ফিরে যাওয়া যাবে না। এই গভীর বনে কোথায় থাকবে। তখন তারা আবার সূর্য দেবকে স্তবস্তুতি করতে লাগল। তাদের পূজায় সূর্যদেব নিশ্চয় খুশি হলেন। কারণ একটু পরেই দু' বোন দেখল এক রাজা এসেছে সেই বনে শিকার

করতে, সঙ্গে অনেক লোকলস্কর, হাতী ঘোড়া। এই রাজার নাম অনঙ্গশেখর, ইনি পার্বতীপুরের রাজা। রাজা সেই বনের মধ্যে সুন্দরী দু'টি মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জানতে চাইলেন, এই গভীর বনের মধ্যে তারা এলো কি করে? রুমুনা তখন সব কথা রাজাকে খুলে বলল।

রুমুনা-ঝুমুনার কাহিনী শুনে রাজার মনে বড় করুণা হল। তিনি বললেন, চলো, তোমরা আমার প্রাসাদে থাকবে। তাছাড়া রুমুনাকে আমি বিয়ে করবো। রাজার কথা শুনে দু' বোন তো মহাখুশি। রাজপ্রাসাদে ফিরে রাজা অনঙ্গশেখরের সঙ্গে বিয়ে হলো বড় বোন রুমুনার আর ছোট বোন ঝুমুনার বিয়ে হলো রাজার কোটালের সঙ্গে। দু' বোন সুখে বাস করতে লাগল পার্বতীপুর রাজ্যে। কিন্তু রুমুনার ভাগ্যে এ সুখ বেশী দিন সইল না। সে প্রতি রবিবার সূর্যদেবতার পূজা করত। কিন্তু রাজা ছিলেন অন্য দেবতার ভক্ত। সেদিনটা ছিল রবিবার। রুমুনা সূর্যদেবের পূজা করছিল। রাজা তা দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে লাথি মেরে পূজার ঘট ভেঙে দিলেন। রুমুনা রাজার কাণ্ড দেখে প্রতিবাদ করল। রাজা তখন রাণী রুমুনাকে প্রাণদণ্ড দিয়ে কোটালকে বললেন, রাণীকে হত্যা করতে। কোটাল রাণীকে নিয়ে গেল বটে—কিন্তু হত্যা করল না। সে রুমুনার ভগ্নিপতি—তার মনে দয়া হল। সে দূরে নিয়ে গিয়ে গিয়ে রুমুনাকে ছেড়ে দিল। রুমুনা পালিয়ে গেল পার্বতীপুর রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে।

রাজা তাড়িয়ে দিলেন বটে কিন্তু এই বিপদের দিনেও রুমুনার ভক্তি সূর্যদেবের প্রতি একবিন্দু কমলো না। সে জানতো সূর্যদেব নিশ্চয় তাকে আবার দয়া করবেন। রুমুনার সন্তান হবে। সে তাই বনের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বাস করতে লাগল। ঝুমুনা আর কোটাল জানত রুমুনা বনের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে থাকে—তার সন্তান হবে। তারা মাঝে মধ্যে গিয়ে তার খোঁজ খবর নিয়ে

আসত। যথাসময়ে রুমুনার একটি ফুটফুটে ছেলে হল। দুঃখেকষ্টে দিন কাটছিল তাই রুমুনা ছেলের নাম দিল দুখরাজ। কিছু দিন পরে ঝুমুনারও একটি সন্তান হলো।

দিন কেটে যায়। ক্রমে ক্রমে দুখরাজ বড় হলো। সে একদিন বেড়াতে গেল মাসির বাড়ী। মাসি খুব আদর যত্ন করল, অনেক জিনিসপত্র দিল তাকে। কিন্তু পথে আসবার সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তার সব জিনিস কেড়ে নিল। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরল দুখরাজ। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, স্বয়ং সূর্যদেবতা। তিনিই ছদ্মবেশে দুখরাজকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন।

কিছুকাল পরে দুখরাজ আবার আবদার ধরল মাসির বাড়ী যাবে। রুমুনা ছেলেকে নিয়ে গোপনে গেল ঝুমুনার বাড়ী। ঝুমুনা বলল, 'দিদি আর তোকে বনের মধ্যে থাকতে হবে না, আমাদের বাড়ীতেই থেকে যা।' ভগ্নিপতি কোটালও সেই অনুরোধ করল। রুমুনা তাই বোনের বাড়ীতেই থেকে গেল ছেলেকে নিয়ে।

এদিকে হয়েছে কি সূর্যদেবতা একদিন রাজা অনঙ্গশেখরকে স্বপ্ন দিলেন। জানালেন, কিভাবে রাণীর প্রাণরক্ষা হয়েছে, কোথায় আছেন তিনি, জানালেন রাজার একটি পুত্র হয়েছে। রাণী আর পুত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি স্বপ্নে রাজাকে আদেশ করলেন।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। পরের দিনিই তিনি গেলেন কোটালের বাড়ী। গিয়ে কোটালকে বললেন, রাণী আর পুত্রকে ফিরিয়ে দিতে। তারপর রাজা আর রাণী রুমুনার মিলন হল। রাজা রথে করে রাণী আর রাজপুত্রকে নিয়ে যাত্রা করলেন নিজের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

ইতিমধ্যে সূর্যদেব স্থির করলেন, রাজাকেও তাঁর মহিমা দেখাতে হবে। তিনি তাই পথে একটা ঘটনা ঘটাবার ব্যবস্থা করলেন। রাজা রথে যেতে যেতে দেখলেন পথে সাতজন নিম্নশ্রেণীর লোক নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। রাজা রথ থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে

সেই সাতজন লোককে প্রাণদণ্ড দিলেন। জল্লাদরাও তখনি তাদের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে মাথা কেটে ফেলল। সেই সাতজনের মা আর বৌ-রা তখন শোকে দারুণ কান্নাকাটি করতে লাগল। দেখে সূর্যদেবের দয়া হ'ল। তিনি রাজার সামনেই সেই সাত-জনকে তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়ে দিলেন। রাজা তো অবাক। রুমুনা বললে, এ হলো সূর্যদেবের কৃপা।

রাজা বুঝলেন সূর্যদেবের মহিমা কত। তিনিও সূর্যদেবের ভক্ত হয়ে গেলেন। তারপর প্রাসাদে ফিরে খুব ধূমধাম করে পূজার ব্যবস্থা করলেন সূর্যদেবের।

॥ প্রশ্নালোচনা ॥

১। রুমুনা আর ঝুমুনা কে? কি করে তারা সূর্যদেবের দেখা পেল? তাদের দারিদ্র্য দূর হয়ে ছিল কি ভাবে?

২। রাজার মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিয়ে হলো কিভাবে? রুমুনা-ঝুমুনার সৎমা তাদের বাড়ী থেকে তাড়ালো কেন? বাড়ী থেকে তারা কোথায় গেল?

৩। পার্বতীপুরের রাজার নাম কি? তাঁর সঙ্গে রুমুনার বিয়ে হল কি করে? তিনি রাণী রুমুনাকে কেন রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন?

৪। রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেবার পর রুমুনার কি হলো? রাজার সঙ্গে তার আবার মিলন হলো কি করে?

৫। রাজা অনঙ্গশেখরকে সূর্যদেব নিজের মহিমা দেখালেন কি ভাবে? তার ফল কি হলো?
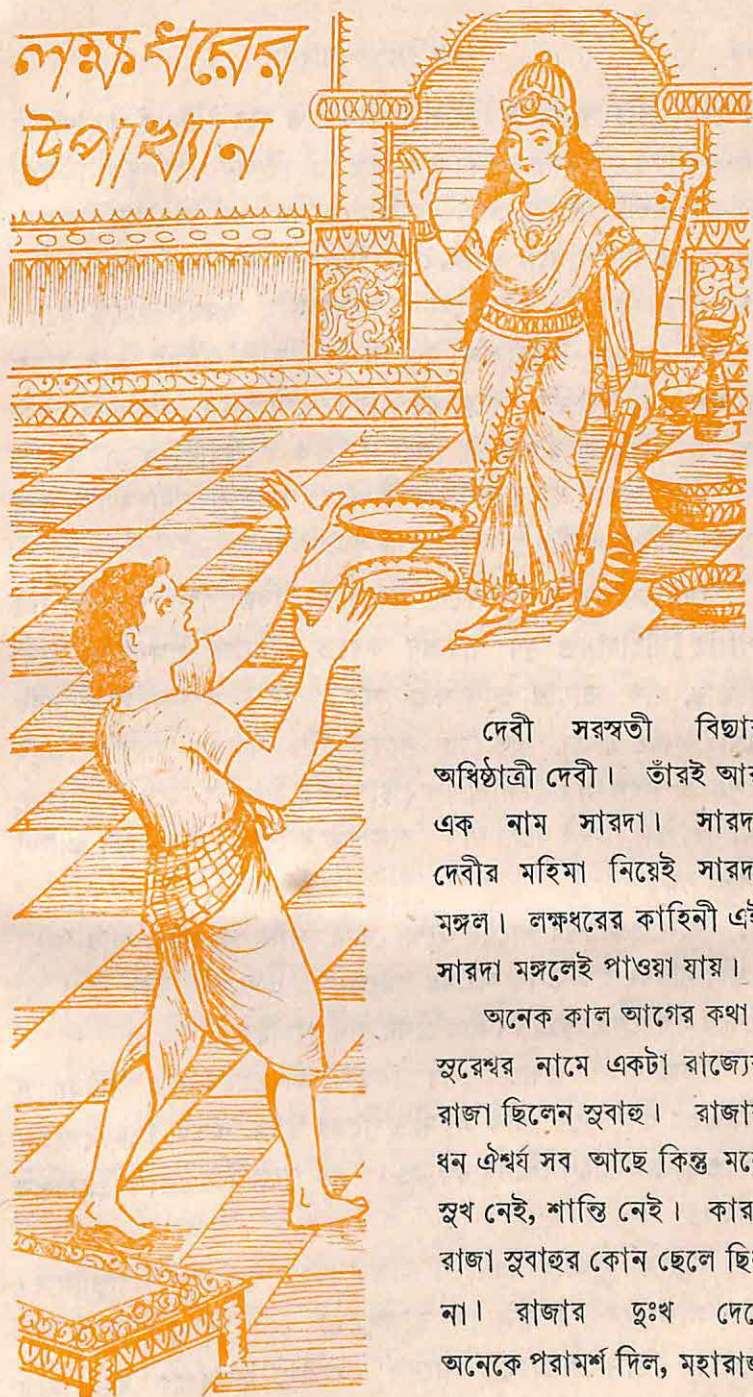
দেবী সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁরই আর এক নাম সারদা। সারদা দেবীর মহিমা নিয়েই সারদা মঙ্গল। লক্ষধরের কাহিনী এই সারদা মঙ্গলেই পাওয়া যায়।

অনেক কাল আগের কথা। সুরেশ্বর নামে একটা রাজ্যের রাজা ছিলেন সুবাহু। রাজার ধন ঐশ্বর্য সব আছে কিন্তু মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। কারণ রাজা সুবাহুর কোন ছেলে ছিল না। রাজার দুঃখ দেখে অনেকে পরামর্শ দিল, মহারাজ,

শিবের তপস্যা করুন তাহলে পুত্রসন্তান লাভ হবে। সুবাহু পুত্র পাবার জন্য তপস্যা করলেন। শিব তুষ্ট হয়ে বর দিলেন। কিছুকাল পরে রাজার একটি ছেলে হলো। রাজা ছেলের নাম রাখলেন লক্ষধর। লক্ষধরের বয়স বাড়তে লাগল, দেখতে দেখতে সাত বছর বয়স হলো। রাজা স্থির করলেন, এবার ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজার কুলগুরু গৌরীদাস খুব পণ্ডিত; তাঁর উপরই ভার পড়ল রাজপুত্রকে শিক্ষিত করে তোলার। গৌরীদাস বললেন, দেবী সারদা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া কেউই বিদ্যালাভ করতে পারে না। তাই তাঁর পরামর্শে মহাধূমধাম করে রাজা দেবী সরস্বতীর পূজার ব্যবস্থা করলেন।

দেবী সরস্বতীর পূজা করে রাজপুত্রের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হলো। পণ্ডিত গৌরীদাসও খুব পরিশ্রম করতে লাগলেন লক্ষধরকে নানা বিদ্যায়, নানা ভাষায় সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য। কিন্তু সবই বৃথা। এত চেষ্টা, এত যত্ন সত্ত্বেও পাঁচ বছরেও লক্ষধর কিছুই শিখতে পারল না। গৌরীদাস হতাশ হয়ে রাজাকে গিয়ে জানালেন, না মহারাজ কিছুই হলো না। রাজপুত্রকে শিক্ষা দান করা আদৌ সম্ভব নয়।

আসলে লক্ষধর আগের জন্মে কোন পাপ করেছিল যার ফলে দেবী সারদা তার উপর অপ্রসন্ন ছিলেন। এইজন্যই তার কৃপা না পেয়ে লক্ষধরের বিদ্যা শিক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু রাজা সুবাহু এসব কিছুই জানতেন না। গৌরীদাস পণ্ডিতের কথা শুনে তিনি একমাত্র পুত্রের উপর এতই চটে গেলেন যে তৎক্ষণাৎ তাকে দিলেন মৃত্যুদণ্ড। মূর্খ পুত্রে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।

রাজার আজ্ঞায় কোটাল রাজপুত্রকে নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে। কিন্তু সারদা দেবী চাননি যে রাজপুত্রের মৃত্যু হোক। তাঁর দয়া হলো। তিনি কোটালকে আদেশ করলেন, লক্ষধরকে মুক্ত করে

দিতে। দেবী সারদার নির্দেশে কোটাল লক্ষধরকে মুক্ত করে দিল। কিন্তু তার ভয় হলো রাজাকে কোন নিদর্শন দেখাতে না পারলে রাজা তাকেই শাস্তি দেবেন। সে তখন একটা শিয়ালকে মেরে তার রক্ত রাজা সুবাহুকে নিয়ে গিয়ে দেখাল।

লক্ষধর মুক্তি পেল কিন্তু তার মনে ভারি দুঃখ হল। বাবা তাকে বাড়ী থেকে শুধু তাড়িয়েই দেন নি প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। তাই বাড়ী ফিরে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মনের দুঃখে তাই সে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হলো এক গভীর বনে। দেবী সারদা ইতিমধ্যে বনের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘর করে সেখানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে বাস করছিলেন। লক্ষধরের অবস্থা দেখে তাঁর মনে দয়া হয়েছিল। বনে এসে লক্ষধর যাতে থাকতে পারে তাই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। বনে এসে লক্ষধর সেই কুটীর আর ব্রাহ্মণীকে দেখতে পেল। ব্রাহ্মণী তাকে খুব স্নেহযত্ন করে নিজের কুটীরে রাখলেন।

সেই কুটীরে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছিল রাধা-কৃষ্ণের একটা পুঁথি। সেই পুঁথিটা ছিল বৃদ্ধার খুব প্রিয়। কিন্তু লক্ষধর ছিল একেবারেই অক্ষরজ্ঞানহীন। সে পুঁথিটা নাড়া চাড়া করত কিন্তু কিছুই বুঝতো না। একদিন বৃদ্ধা কোন কাজে বাইরে গেছে, সেই সময় লক্ষধর পুঁথিটা নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিল।

ব্রাহ্মণী কুটীরে ফিরে রাধা-কৃষ্ণের পুঁথিটা না দেখতে পেয়ে লক্ষধরের উপর খুব চটে গেলেন। কিন্তু তারপরই তাঁর মনে হল, লক্ষধরের তো দোষ নেই। সে মূর্খ। পুঁথির মর্ম বোঝে নি বলে সেটা ফেলে দিয়েছে। আসল দরকার লক্ষধরকে শিক্ষিত করে তোলা। তিনি সেই ব্যবস্থাই করলেন।

তিনি লক্ষধরকে বললেন, বৈদের নামে একটা রাজ্য আছে—তুমি সেখানে যাও। সেখানে রাজার চার কন্যা আছে। তুমি রাজবাড়ীতে গিয়ে রাজকন্যাদের চাকরের কাজ নেবে। জনার্দন ওঝা হচ্ছেন

রাজকন্যাদের শিক্ষক। তিনি খুব পণ্ডিত। রাজকন্যারাও পড়াশুনো করতে খুব ভালোবাসেন। রাজকন্যারা যখন গুরুর কাছে লেখাপড়া করবে তখন তুমি সে সব শুনবে। এইভাবে তোমার লেখাপড়া শেখা হবে। ব্রাহ্মণীর কথায় লক্ষধরের লেখাপড়া শেখার খুব ইচ্ছে হল। সে তাঁর কথা মতো গেল বৈদের রাজ্যে। সেখানে গিয়ে রাজকন্যাদের ভৃত্যের কাজ নিল সে।

বৈদেরে চাকরের কাজ নেবার সময় লক্ষধর নিজের নাম বলল ধূলাকুট্যা। ধূলাকুট্যা রাজকন্যাদের সেবা করে, কাজকর্ম করে কিন্তু নজর রাখে লেখাপড়ার দিকে। রাজকন্যাদের জ্ঞানগর্ভ আলাপ-আলোচনা শুনে সেও আরো বেশী বিদ্যালাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রাজকন্যারা যখন গুরুর কাছে পড়া করে তখন সেও একমনে তা শোনে। এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

তারপর এলো সরস্বতী পুজো। খুব ধূমধাম করে পুজো হচ্ছে। পুজোর সব কিছু ফলমূল, জিনিসপত্র পাহারা দেবার ভার পড়ল ভৃত্য ধূলকুট্যার উপর। সেও পরম আগ্রহ যত্ন সহকারে সেসব পাহারা দিতে লাগল—যাতে একটা জিনিসও নষ্ট না হয়। কেউ যেন কোন জিনিসে হাত দিতে না পারে।

সারা রাত ধরে জেগে পাহারা দিতে লাগল সে। কিন্তু রাতের শেষ প্রহরে তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে একটু সময়ের জন্য ঢুলে পড়ল ঘুমে। আর সেই ফাঁকে এক বৃদ্ধা এসে পুজোর ফলমূলগুলো খেয়ে ফেলতে লাগল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ধূলাকুট্যার। সে দেখে এক বুড়ী বসে বসে পুজোর ফলমূলগুলো দিব্যি খেয়ে নিচ্ছে। সে তো লাফিয়ে উঠে গিয়ে ধরে ফেলল বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধা আর কেউ নন। তিনি স্বয়ং দেবী সরস্বতী! ধূলাকুট্যা তাঁকে ধরতেই তিনি নিজ মূর্তি প্রকাশ করলেন। ধূলাকুট্যা তো সামনে দেবী সরস্বতীকে দেখে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল। দেবী তখন তাকে বর দিলেন;

বললেন, খুব অল্পদিনের মধ্যেই ধূলাকুট্যা সর্ববিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠবে।

ধূলাকুট্যা তো দেবীর বরে পণ্ডিত হয়ে উঠল। এদিকে রাজ-কন্যাদের শিক্ষাগুরু জনার্দন মনে মনে একটা কুমতলব ঠাউরেছিল। সে লেখাপড়ায় পণ্ডিত ছিল বটে কিন্তু মানুষটা মোটেই ভাল ছিল না। সে ঠিক করল, ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাজকন্যাদের বিয়ে করে নিয়ে পালাবে। একদিন রাজকন্যাদের সে বললে তোমরা যদি আমায় বিয়ে করো আর লুকিয়ে নৌকো করে আমার সঙ্গে অন্য রাজ্যে পালিয়ে যাও তবে আমার যতকিছু বিদ্যা তোমাদের সব কিছু শিখিয়ে দেবো।

রাজকন্যাদের বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ বড়ই প্রবল। তাছাড়া তারা সাদাসিধে প্রকৃতির মেয়ে, ছলচাতুরী কিছুই বুঝতো না। তাই তারা জনার্দন ওঝার কথায় রাজী হয়ে গেল।

রাজা যাতে কিছু জানতে না পারেন তাই গভীর রাতে পালানোর ব্যবস্থা হলো। জনার্দন ব্যবস্থা করল, নিশুতি রাতে রাজবাড়ীর ঘাটে নৌকো বাঁধা থাকবে। তাতে থাকবে জনার্দন নিজে। রাজকন্যারা রাজবাড়ী ছেড়ে সেখানে গিয়ে নৌকোয় উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছেড়ে দেবে। তারা নৌকোয় করে চলে যাবে অন্য কোন রাজ্যে।

কিন্তু দেবী সারদা জানতে পারলেন জনার্দনের মতলবের কথা। তিনি জানতেন জনার্দনের সঙ্গে গেলে রাজকন্যাদের সর্বনাশ হবে। তাই তিনি কৌশল করে জনার্দনকে তার নিজের বাড়ীতে আটক করে রাখলেন। আর ধূলাকুট্যাকে বললেন, সে যেন নৌকোয় গিয়ে রাজকন্যাদের নিয়ে চলে যায়। দেবীর কথামত কাজ হলো। ধূলাকুট্যা গিয়ে নৌকোয় আগে থাকতেই বসে রইল। রাজকন্যারা নিশুতি রাতে নৌকোয় গিয়ে চাপতেই দেবী সারদা নিজেই নৌকোর দাঁড় ধরলেন।

নৌকো চলতে লাগল। রাতের গভীর অন্ধকারে নৌকোর মধ্যে কেউ কাউকেই দেখতে পেল না। কিন্তু সকাল হতেই রাজকন্যারা তো অবাক! কোথায় জনার্দন? এযে নৌকোয় বসে রয়েছে ধূলাকুট্যা! তখন দেবী সারদা সব কথা রাজকন্যাদের জানিয়ে বললেন, তারা যেন ধূলাকুট্যাকেই বিয়ে করে। রাজকন্যারাও দেবীর কথামতো ধূলাকুট্যাকে বিয়ে করল।

বিয়ের পর ধূলাকুট্যা রাজকন্যাদের নিয়ে তাদের নিজেদের রাজ্য সুরেশ্বরে হাজির হলো। কিন্তু সে রাজবাড়ীতে গেল না—পিতার কাছে গিয়ে নিজের পরিচয়ও দিল না। রাজা সুবাহু তখন বৃদ্ধ, অশক্ত হয়ে পড়েছেন। ভালো করে রাজ্য দেখাশোনা করতে পারেন না। রাজ্য তাঁর তাই শ্রীহীন। তাঁর মনেও সুখ নেই। তিনি তখনও জানেন তাঁর ছেলে লক্ষধর তাঁরই আদেশে কোটালের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

লক্ষধর দেশে ফিরে এক বণিকের বাড়ীতে আশ্রয় নিল; এই বণিকের নাম বিজয় দত্ত। তারপর দেবী সারদার অনুগ্রহে অনেক পতিত জমি নিয়ে এক নগর পত্তন করল।

নতুন নগর পত্তন হবে। তাই লক্ষধর বা ধূলাকুট্যা নিজের বাড়ীতে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করল। সেই ভোজে দেশের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হলো—রাজাকেও নিমন্ত্রণ করল লক্ষধর। কিন্তু রাজা সুবাহু যখন নিমন্ত্রণে এলেন তখন লক্ষধর তাকে কোনরকম আদর আপ্যায়ন করল না। এতে রাজা সুবাহু ভীষণ চটে গেলেন! তাঁর রাজ্যে থেকে তাঁকে এই অপমান! মৃত্যুদণ্ডই এর উপযুক্ত শাস্তি।

তিনি কোটালকে আদেশ দিলেন, ধূলাকুট্যাকে নিয়ে গিয়ে প্রাণদণ্ড দিতে। কিন্তু দেবী সারদা বাধা দিলেন। দেবীর আদেশে কোটাল আবার মুক্তি দিল ধূলাকুট্যাকে। এতে রাজা সুবাহুর ক্রোধ আরো বেড়ে গেল। তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন

কোটালের। তখন দেবী সারদা স্বয়ং আবির্ভূত হলেন রাজার সামনে। তিনি ধূলাকুট্যা বা লক্ষধরের সব কাহিনী খুলে বললেন, রাজা সুবাহুকে।

সুবাহুর তখন আনন্দ আর ধরে না। তিনি ভেবেছিলেন তার পুত্র লক্ষধর মারা গেছে। এখন দেখলেন লক্ষধর বেঁচে আছে, আর কোটালই তার প্রাণরক্ষা করেছিল। তিনি তখন সকলকে ক্ষমা করলেন। রাজপুত্র লক্ষধর আর পুত্রবধূদের নিয়ে মহানন্দে ফিরে গেলেন রাজবাড়ীতে।

এতদিন পরে রাজপুত্র ফিরে এসেছে তাই রাজবাড়ীতে খুব উৎসব-আনন্দ হতে লাগল। আর সেই সঙ্গে দেবী সারদার মাহাত্ম্যও প্রচারিত হতে লাগল সারা দেশ জুড়ে।

॥ প্রশ্নালোচনা ॥

১। সুবাহু কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন? লক্ষধর কে? লক্ষধরের লেখাপড়ার ভার প্রথমে কার উপর দেওয়া হয়েছিল?

২। লক্ষধর কিছুই শিখতে পারল না কেন? রাজা তখন কি করলেন? প্রথমবার লক্ষধরের জীবনরক্ষা হল কিভাবে?

৩। রাজবাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে লক্ষধর কোথায় গেলেন? সেখানে তার সঙ্গে কার দেখা হল? তিনি লেখাপড়া শেখার জন্য লক্ষধরকে কি করতে বললেন।

৪। বৈদের রাজ্যে লক্ষধরের নাম কি হল? তিনি কি করে সর্ববিদ্যা-বিশারদ হলেন?

৫। বৈদের রাজ্যের রাজকন্যাদের সঙ্গে লক্ষধরের কি করে বিয়ে হল? বিয়ের পর আবার পিতাপুত্রের কি করে মিলন হলো?

———

পুষ্প দন্তের উপাখ্যান

পুষ্পদন্তের কাহিনী আছে রায়মঙ্গলে। বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যেই রচিত হয়েছিল রায়মঙ্গল কাব্য। বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন। এই সুন্দরবনের এখন খানিকটা পশ্চিমবঙ্গে আর বেশীর ভাগ পূর্ব-বঙ্গ বা বাংলাদেশে রয়েছে। এখন যতটা অঞ্চল জুড়ে সুন্দরবন, অতীতে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী অঞ্চলে সুন্দরবন বিস্তৃত ছিল। তাছাড়া সারা দেশেই ছিল অনেক বেশী ঘন বন। এত শহর নগর তখন গড়ে ওঠে নি। ঐ সব বনে বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, বুনো শুয়োর ইত্যাদি নানারকম বুনো জন্তু জানোয়ার বাস করত।

মানুষকে বাঁচতে হতো তাদের সঙ্গে লড়াই করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ের ছিল সুন্দরবনের বিরাট বিরাট বাঘগুলো। সুন্দরবনের বাঘ শুধু জীবজন্তুই খায় না, তাদের অনেকেই মানুষ-খেকো। বনের মধ্যে যারাই যেত কাঠ কাটতে, কিংবা মধু সংগ্রহ করতে কিংবা অন্যকোন দরকারে তাদের অনেককেই যেতে হতো বাঘের পেটে। মানুষ তাই বাঘের এক দেবতা-কল্পনা করে তার নাম দিয়েছিল দক্ষিণ রায়। লোকে মনে করত, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়কে তুষ্ট রাখতে পারলে তাদের কোন অকল্যাণ হবে না। কারণ দক্ষিণ রায়ই ছিলেন দক্ষিণের বনাঞ্চলের অধিপতি।

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। খড়দহে এক অল্প বয়সী ধনী বণিক ছিলেন, তাঁর নাম পুষ্পদত্ত। পুষ্পদত্ত শুধু যে দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন তাই নয়। দেশের নানা জিনিসপত্র নিয়ে ডিঙায় করে তিনি সমুদ্রপথে অন্য দেশেও যেতেন বাণিজ্য করার জন্যে। সেখানে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ নিয়ে ফিরে আসতেন স্বদেশে।

একবার অনেক পণ্যসম্ভার নিয়ে বিদেশ যাত্রার জন্যে পুষ্পদত্তর দরকার পড়ল বড় বড় ডিঙার। তিনি রতাই বাউল্যা নামে একজন কাঠের মিস্ত্রিকে বললেন ছয়টা বড় ডিঙা তৈরী করে দেবার জন্যে। রতাই বাউল্যা খুব ভাল ডিঙা তৈরী করে। কিন্তু ভালো ডিঙা তৈরী করতে হলে দরকার ভালো কাঠের। ভালো কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে? বিশেষ করে ছ'ছটা বড় ডিঙার জন্যে। সমুদ্রগামী বড় ডিঙার ভালো কাঠ পাওয়া যেত সুন্দরবনে। রতাই বাউল্যা তাই তার একমাত্র ছেলে আর ছয় ভাইকে নিয়ে কাঠ জোগাড় করতে গেল সুন্দরবনে নৌকোয় করে।

বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তারা আট জনে মিলে অনেক কাঠ সংগ্রহ করল। বনের কাঠে তাদের সব কটা নৌকোই ভরে গেল। নদীতে নৌকো বাধা ছিল। কাঠ ভর্তি হয়ে যাবার পর সকলে

নৌকোয় উঠতে যাবে এমন সময় একটা বিরাট বড় গাছ দেখে তাদের লোভ হলো। রতাই বাউল্যা আদেশ দিল, এই বড় গাছটাও কেটে ফেল। এর কাঠ খুব ভাল জাতের। এতে কাঠও হবে অনেক। নৌকো গড়ার তাতে সুবিধা হবে। রতাই-এর কথায় তখনই তার লোকজন সেই গাছটা কেটে ফেলল।

কিন্তু এই বিরাট গাছটায় থাকতেন ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়। তিনি গাছ কেটে ফেলায় খুবই চটে গেলেন। রতাই-রা আগেই অনেক কাঠ পেয়েছিল তবু তাদের লোভের শেষ নেই। লোভের বশেই তারা এই বড় গাছটা কেটেছিল বলে দক্ষিণ রায়ের রাগ হলো। তিনি ঠিক করলেন, রতাই আর তার লোকজনকে শাস্তি দিতে হবে।

দক্ষিণরায়ের অনুগত প্রজারা সব বাঘ। তিনি ক'টি বিশ্বস্ত বাঘ-প্রজাকে আদেশ দিলেন, রতাই-এর ছয় ভাইকে মেরে ফেলো। কিন্তু রতাই বা তার ছেলের কোন ক্ষতি করো না। তার আদেশ পাবামাত্র বাঘরা রতাই-এর ছয় ভাইকে মেরে ফেলল। ভাইদের বাঘে মেরেছে দেখে রতাই শোকে ভেঙে পড়ল। তার কথামত কাঠ কাটতে এসেই না ভাইদের এই সর্বনাশ! সুতরাং সেও আর এ প্রাণ রাখবে না। সেও আত্মঘাতী হবে।

রতাই মরার জন্যে সংকল্প করেছে এমন সময় সে শুনল এক দৈববাণী। দক্ষিণরায় তাকে বললেন, দেখো তুমি যদি তোমার একমাত্র পুত্রকে বলি দাও তাহলে তুমি তোমার ছ' ভাই-এর জীবন ফিরে পাবে। এক দিকে একমাত্র পুত্রের জীবন আর অন্য দিকে ছ'ভাই। রতাই পুত্রকে ভালবাসত তো বটেই কিন্তু ছ ভাইকেও কম ভালবাসত না। তাছাড়া তার জন্যেই তো ভাইদের প্রাণ গেছে। সে তাই স্থির করল ভাইদের প্রাণ রক্ষার জন্যে পুত্রকেই বলি দেবে।

দক্ষিণরায়ের কাছে সে পুত্রকে বলি দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে

তার ছ ভাই বেঁচে উঠল। শুধু তাই নয় তার ভক্তি আর ভ্রাতৃপ্রেম দেখে দক্ষিণরায় এতই খুশি হলেন যে, তিনি রতাই-এর ছেলেকেও বাঁচিয়ে দিলেন।

রতাই-এর আনন্দ আর ধরে না। ভাইদের আর পুত্রকে সঙ্গে করে কাঠ নিয়ে সে ফিরে গেল খড়দহে। তারপর সে ডিঙা তৈরী সুরু করল। যথাসময় ডিঙা তৈরী শেষ হল। পুষ্পদত্ত তখন তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে সমুদ্র যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলেন। সমুদ্র যাত্রা করতে হলে আগে দেশের রাজার অনুমতি নিতে হয়। পুষ্পদত্ত রাজার অনুমতি নিতে গেলেন। রাজা প্রথমে অনুমতি দিতে চাইলেন না। পুষ্পদত্ত অনেক করে রাজাকে বোঝালেন। বললেন, একবার তাঁর পিতা সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে আর ফিরে আসেন নি। পুষ্পদত্ত এখন তার হারানো পিতাকে খুঁজে বার করতে চান। রাজা তখন অনুমতি দিলেন পুষ্পদত্তকে সমুদ্র যাত্রার।

পুষ্পদত্তর মা ছিলেন দক্ষিণ রায়ের খুব ভক্ত। তিনি পুষ্পদত্তকে পরামর্শ দিলেন, তুমি সব সময়ই দক্ষিণরায়ের কথা স্মরণ করবে। বিপদে পড়লেই তাঁকে মনে প্রাণে ডাকবে। তিনিই তোমায় সব রকম বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন। পুষ্পদত্ত চলে যাবার পর তাঁর মা নিজেও দক্ষিণরায়কে ভক্তিভরে পুজো করতে লাগলেন। পুজোয় তুষ্ট হয়ে দক্ষিণরায় তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার ছেলেকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করব আমি। এই বলে তিনি বিদায় নিলেন।

এদিকে পুষ্পাদত্তর ডিঙা ছাড়ল খড়দহ থেকে। তারপর কল্যাণপুর, হোগলাপাথরঘাটা, বারাসত হয়ে এসে পৌঁছলো খনিয়া বলে একটা জায়গায়। এখানে এসে পুষ্পদত্ত ডিঙা থেকে নেমে দক্ষিণরায়ের পুজোর থানে তাঁকে পুজো করলেন। পুষ্পদত্ত দেখলেন, একটা বেদীর ওপর রয়েছে দক্ষিণরায়ের মাটির তৈরী একটা মুণ্ড।

আবার সেই বেদীকে ঘিরে কয়েকজন মুসলমান ফকিরও উপাসনা করছে। এটা একটা পীরের আস্তানাও বটে। একই জায়গায় পীর আর দক্ষিণরায়ের পুজো হচ্ছে পাশাপাশি। পুষ্পদত্ত এর কারণ কি জানবার জন্যে ফকিরদের কাছে সব কিছু জানতে চাইলেন। ফকিররা জানালেন, এককালে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে এখনকার মুসলমান দেবতা বড় গাজিখাঁর প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল। দু'জনেই শক্তিমান, কেউ কাউকে হারাতে পারলেন না। কিন্তু লড়াই-এর ফলে লোকজনের দারুণ ক্ষতি হতে লাগল। লোকে ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগল। ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল তাদের বাঁচাবার জন্যে। তখন ভগবান অর্ধেক কৃষ্ণ আর অর্ধেক পয়গম্বর মূর্তিতে এসে দক্ষিণরায় আর বড় গাজিখাঁর মধ্যে একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠিক হল, দক্ষিণরায় ভাঁটি অঞ্চলের অধীশ্বর হবেন, হিজলীর অধিশ্বর হবেন কালু রায় আর সব জায়গায় পুজো পাবেন গাজি খাঁ। আর গাজি খাঁর সমাধির পাশে সর্বত্রই পুজো করা হবে দক্ষিণরায়ের মুণ্ড। তখন থেকেই দুই দেবতার পুজো এক জায়গাতেই হয়।

ফকিরদের কথা শুনে পুষ্পদত্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। যাই হোক দক্ষিণরায়ের পুজো সেরে পুষ্পদত্ত সেখান থেকে আবার যাত্রা সুরু করলেন। পথে ছত্রভোগ ও মগরা হয়ে তার ডিঙা গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ল। তারপর তাঁরা পৌঁছোলেন উড়িষ্যার উপকূলে। সেখান থেকে গেলেন রামেশ্বরে। রামেশ্বর হয়ে আবার চললেন রাজদহে। রাজদহে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে পুষ্পদত্ত অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, চারিদিকে সমুদ্রের বিপুল দিগন্তবিস্তারী জলরাশির মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ব নগরী। সেই নগরীতে দেখা যাচ্ছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা। সমুদ্রের মধ্যে এমন নগরী দেখে পুষ্পদত্তের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সঙ্গের লোকজনকেও সেই দৃশ্য দেখালেন, কিন্তু তারা কেউ সেই নগরী

দেখতে পেল না। পুষ্পদত্ত স্বচক্ষে সেই নগরীর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন, অথচ তাঁর লোকেরা দেখছে শুধু জল আর জল।

এরপর তাঁদের দলবল এসে হাজির হল তুরঙ্গ রাজ্যে। সমুদ্রের উপকূলে তুরঙ্গ রাজ্যের রাজা হলেন সুরথ। পুষ্পদত্ত কোটালের কাছে গিয়ে বললেন, তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করবেন। কোটাল তাঁর অনুরোধে পুষ্পদত্তকে নিয়ে গেল রাজা সুরথের কাছে। রাজা সুরথ জানতে চাইলেন, এই অল্প বয়েসেই কেন পুষ্পদত্ত সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছেন।

পুষ্পদত্ত বললেন, তাঁর বাবা অনেক দিন ধরে নিখোঁজ হয়েছেন। সমুদ্রযাত্রা করতে গিয়েই তিনি নিখোঁজ হন। তাই পুষ্পদত্ত সমুদ্রে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খোঁজ করছেন তাঁর নিরুদিষ্ট পিতার।

সুরথ রাজা পুষ্পদেত্তর কথায় খুশি হলেন ; তিনি জানতে চাইলেন তাঁর সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা। পুষ্পদত্ত তখন তাঁকে সেই আশ্চর্য নগরীর কথা বললেন। কিন্তু সুরথ এই অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁর ধারণা হল, পুষ্পদত্ত বানিয়ে মিথ্যা গল্প বলছেন। তিনি এজন্যে পুষ্পদত্তকে তিরষ্কার করলেন।

পুষ্পদত্ত এতে অপমানিত বোধ করলেন। তিনি বললেন, আমি নিজ চোখে যা দেখেছি তা মিথ্যা হতে পারে না। আমি আপনাকেও সেই অত্যাশ্চর্য নগরী দেখাতে পারি—যদি আপনি আমার সঙ্গে যান। যদি দেখাতে না পারি তবে আপনি আমায় শাস্তি দেবেন।

রাজা সুরথ বললেন, ঠিক আছে। যদি দেখাতে না পার তবে তোমার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। আর যদি দেখাতে পার তবে তোমায় অর্ধেক রাজত্ব দেবো আর রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো।

পুষ্পদত্ত রাজা সুরথকে নিয়ে গেলেন রাজদহের সেই জায়গায়

যেখানে তিনি সেই অপূর্ব নগরী দেখেছিলেন। কিন্তু এখন রাজা সুরথকে তিনি সে নগরী দেখাতে পারলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পদত্তকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন ; পরের দিন তাঁর শিরশ্ছেদ করা হবে। পুষ্পদত্তের তখন মায়ের কথা মনে পড়ল। এই ঘোর বিপদে একমাত্র দেবতা দক্ষিণ রায় তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি একমনে দক্ষিণ রায়ের পুজো করতে লাগলেন। পরের দিন পুষ্পদত্তকে বধ করার জন্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু দেবতা দক্ষিণ রায়ের আদেশে তাঁর ব্যাঘ্র-প্রজারা এসে কোটালকে আক্রমণ করল। রাজা সুরথের লোকজন সব পালিয়ে গেল। দক্ষিণ রায় স্বয়ং রথে করে এসে রক্ষা করলেন পুষ্পদত্তকে।

রাজা সুরথের কাছে এ সংবাদ পৌঁছোলো। তিনি ভাবলেন বুঝি অন্য কোন রাজা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছে। তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে হাজির হলেন সেই বধ্যভূমিতে। তুমুল যুদ্ধ হল দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে সুরথের। কিন্তু সুরথ দেবতা দক্ষিণ রায়ের হাতে পরাজিত ও নিহত হলেন। সুরথের রাণী এ খবর পেয়ে শোকে অভিভূত হয়ে খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

রাণী বিলাপ করছেন, এই সময় হঠাৎ দক্ষিণ রায় তাঁর রথে চেপে ঘটনাস্থলে এলেন। তিনি রাণীকে বললেন, রাজা সুরথ আমার ভক্ত পুষ্পদত্তকে অকারণে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল তাই আমি তাকে বধ করেছি। তুমি প্রতিজ্ঞা করো, তোমার মেয়ের সঙ্গে পুষ্পদত্তের বিয়ে দেবে, আর আমার পুজো চালু করবে। তাহলেই তোমার মঙ্গল হবে।

রাণী তাতে সম্মত হলেন। দক্ষিণ রায়ও রাজা সুরথ আর তাঁর সৈন্যসামন্তদের জীবনদান করলেন। রাজা এবং তাঁর লোকজন বেঁচে ওঠায় রাণীর আনন্দ ধরে না। তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে পুষ্পদত্তের বিয়ে দিলেন।

বিয়ে-থার পর পুষ্পদত্ত দেবতা দক্ষিণ রায়কে বললেন, আমার

পিতাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাঁকে তো আমি পেলাম না। তাঁর কি হবে?

দক্ষিণ রায় জানালেন, পুষ্পদত্তের পিতা তুরঙ্গ নগরীতেই কারাগারে আটক আছেন। তিনিও রাজাকে সেই অপূর্ব নগরী দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখাতে পারেন নি। তার ফলেই তিনি কারারুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি দক্ষিণ রায়ের ভক্ত ছিলেন না, তাই তাঁর মুক্তি হয় নি। এখন পুষ্পদত্তের কল্যাণে তাঁর পিতাও কারাগার থেকে ছাড়া পাবেন।

পুষ্পদত্তের বাবার নাম দেবদত্ত। তিনি অনেকদিন কারাগারে আটক ছিলেন। এখন পুষ্পদত্ত নিজে গিয়ে পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনলেন। পিতা পুত্রের দীর্ঘকাল বাদে মিলন হল। দেবদত্ত তার ছেলে আর পুত্রবধূকে নিয়ে নিজের দেশ খড়দহে ফিরে গেলেন। সেখানে লোকমুখে পুষ্পদত্তের কাহিনী প্রচার লাভ করল। সকলে তখন থেকে দেবতা দক্ষিণ রায়ের পুজো করতে লাগলেন ব্যাপকভাবে।

॥ প্রশ্নালোচনা ॥

১। পুষ্পদত্ত কে? তার দেশ কোথায় ছিল? তিনি সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন কেন?

২। পুষ্পদত্ত সমুদ্র যাত্রার জন্য কাকে ডিঙা বানাতে দিয়েছিলেন? ডিঙা বানাবার আদেশ পেয়ে তিনি কি করেছিলেন?

৩। রতাই বাউল্যা কে? দেবতা দক্ষিণ রায় কেন তার উপর রেগে গিছলেন? পরিণামে কি হয়েছিল?

৪। পুষ্পদত্ত সমুদ্রযাত্রা কোথা থেকে সুরু করেছিলেন? তিনি কোথায় কোথায় গেছলেন? কোথায় তিনি সমুদ্রের মধ্যে অদ্ভুত নগরী দেখতে পেলেন?

৫। সুরথ কোথাকার রাজা ? তিনি প্রথমে কেন পুষ্পদত্তের উপর খুশি হয়েছিলেন ? পরে কেন তিনি তাকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন ? পুষ্পদত্তের জীবনরক্ষা পেল কি ভাবে ?

৬। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে রাজা সুরথের যুদ্ধ হল কেন ? যুদ্ধের ফল কি হলো ? সুরথ আবার জীবন ফিরে পেলেন কি ভাবে ?

৭। পুষ্পদত্তের বাবার নাম কি ? তিনি নিখোঁজ হয়ে কোথায় ছিলেন এবং কেন সেখানে ছিলেন ? তিনি কি করে মুক্তি পেলেন ? মুক্তি পাবার পর তিনি কি করলেন ?

সমাপ্ত